সনাতন ভারত
গৌরব-ঐতিহ্যময়ী
ত্রিপুরা
ডাঃ সৌরিশ দেববর্মন

“সনাতন ভারত গৌরব
—ঐতিহ্যময়ী ত্রিপুরা”

ডাঃ সৌরিশ দেববর্ম্মন

“সনাতন ভারত গৌরব –ঐতিহ্যময়ী ত্রিপুরা”

Sanatan Bharat Gaurav Oitihyamoyee Tripura

First Edition :
2017

Author :
Dr. Sourish Dev Barman, M.S., Assistant Professor,
Agartala Government Medical College.

Published by :
Tripur Kshatriya Samaj
Agartala, Tripura

Printed by:
Kalika Press Pvt. Ltd., Agartala

Cover :
Samar Sen

Price : 30.00

উৎসর্গ

ত্রিপুরার গৌরবে গৌরবান্বিত
আপামর সাধারণ ত্রিপুরাবাসী।
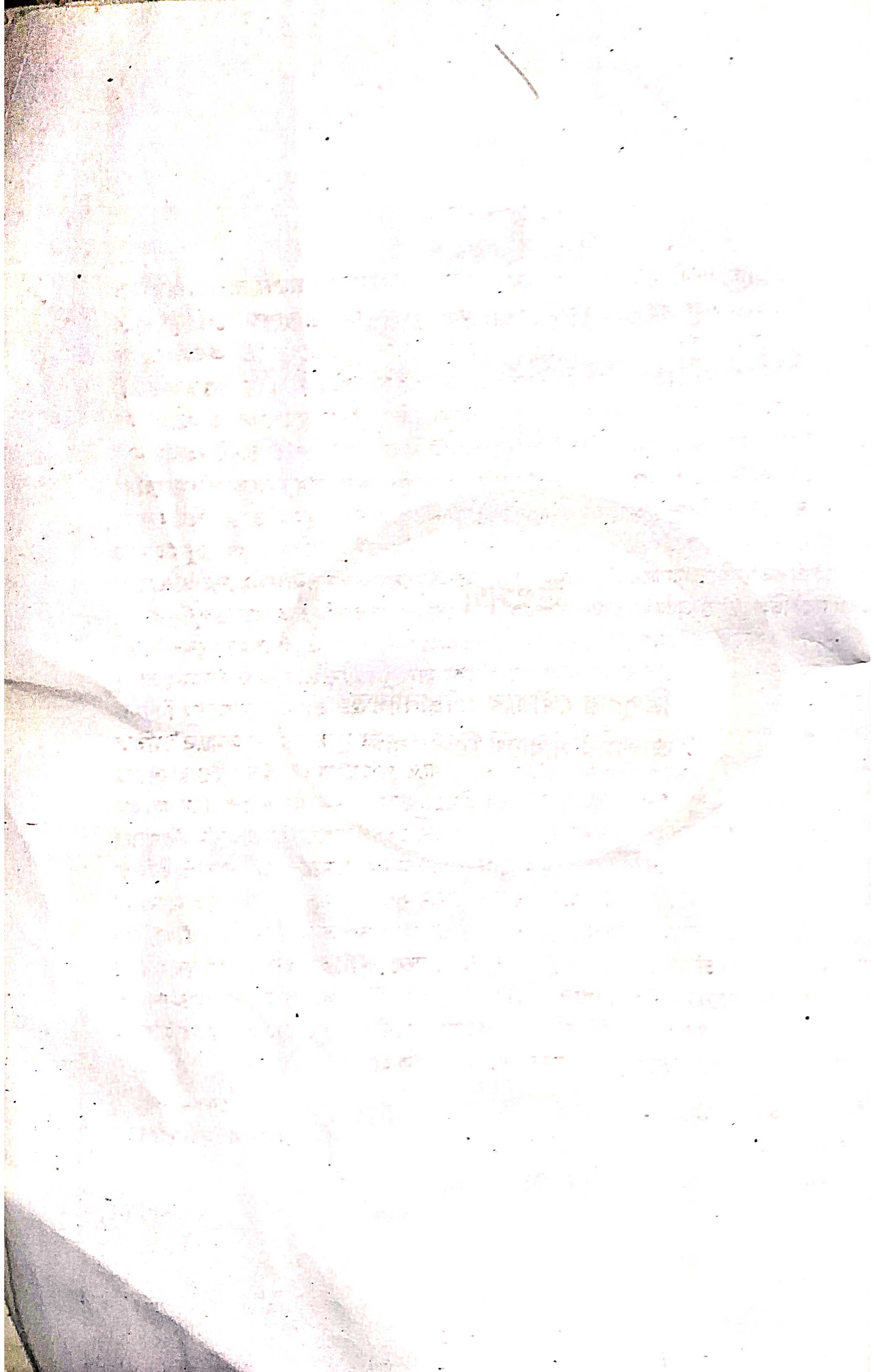
।। মুখবন্ধ ।।

ত্রিপুরা একটি সুপ্রাচীন রাজ্য যেখানে একই ক্ষত্রিয় রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল শতাব্দী ধরে এবং এই রাজবংশ নিজেদের মহাভারত খ্যাত চন্দ্র বংশজ বলে দাবী করে এসেছে আবহমানকালধরে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিই হল এর বহু শতাব্দী প্রাচীন রাজন্য ইতিহাস। যুগান্তর ধরে এই রাজ্যের সংস্কৃতির মধ্যে যে বিশুদ্ধ সনাতনী প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে আছে তা কখনও সম্ভব হত না যদি না এখানকার রাজশক্তি একে রক্ষা করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতেন। ঐতিহাসিক যুগ থেকেই বিভিন্ন বিদেশী শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমন করলেও কোনদিন এর আত্মা সনাতনী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে সক্ষম হয়নি। সেদিন ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমনকারীদের আগ্রাসন থেকে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে যে কটি হিন্দু রাজ্য প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে ত্রিপুরার নাম সর্বদাই প্রথম সারিতে থাকবে। ত্রিপুরার অদম্য রাজশক্তি সেদিন সনাতনী জনগনের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আজ আমরা আমাদের পূর্বসুরিদের বলিদান কে সঠিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো তো দূরের কথা মনে রাখাটাও প্রয়োজন মনে করিনা। ত্রিপুরার সনাতনী ইতিহাস ও রাজ ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের মনে প্রতিনিয়ত হীনমন্যতা ও নেতিবাচক চিন্তা চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। আজ এই ভয়ংকর বিস্মৃতির বিষময় ফল দেখা দিচ্ছে আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় চেতনাতেও। শুধুমাত্র যুদ্ধে জয় নয়, সমাজে নৈতিক আচার আচরণের রাষ্ট্রীয়করনেরও নিয়মিত ধারা দেখতে পাওয়া যায় সেইসব বীর রাজাদের শাষনে। আজ সেই সব অসংখ্য বীরগাঁথা রুপকথা মনে হলেও, কোনদিন ধর্মকে রক্ষা করবার নিমিত্তে আমাদের রাজ্যের বীর সৈনিকেরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে পিছপা হননি। ত্রিপুরার সমাজ আজ বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত। এর অন্যতম কারণ আমরা আমাদের গৌরবশালী ঐতিহ্য থেকে বহুদূরে সরে এসেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দৃঢ়চেতা সংগ্রামী সেইসব রাজাদের যাতে না ভুলে যায় সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই বইটি লেখা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে ত্রিপুরার এই গৌরবান্বিত অধ্যায় থেকে রাষ্ট্রভক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তবেই বইটির সার্থকতা। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি দিনের আলো দেখতে পেয়েছে তাদের সবাইকে আমার হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। যদি রাষ্ট্রের প্রতি গৌরববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার চেতনা এই বইটির মাধ্যমে নবজাগরণ লাভ করে, তবে বুঝব আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

দীপাবলী, ২রা কার্তিক, ১৪২৭ ত্রিং,
১৯.১০.২০১৭
আগরতলা,

নিবেদক
সৌরিশ দেববর্মন।

।। প্রাককথন ।।

পৃথিবীর যত রাজবংশ আছে তার মধ্যে জাপানের রাজ বংশের পরেই ত্রিপুরার রাজবংশকে অন্যতম ও প্রাচীন বলা যায়। ভারতের সমস্ত রাজবংশই হয়তো বা সূর্য্যবংশ নতুবা চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভব বলে দাবি করে থাকে। রাজামালার মতে চন্দ্রবংশ থেকে ত্রিপুরার রাজবংশ উৎপন্ন বলে দাবি করা হয়েছে। মহাভারতে উল্লেখিত যযাতি ও শর্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্য থেকে ত্রিপুরীরা তাদের বংশ লতার পরিচয় টেনে থাকেন। মহাভারতের সময় ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন সুব্রায়/শিব্রাই, যিনি ত্রিলোচন নামে খ্যাত ছিলেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ত্রিপুরী সমাজের নিকট তিনি ভগবান শিবের অবতার বলে স্বীকৃত। ত্রিপুরার সভ্যতা ও ইতিহাসে ত্রিলোচন হলেন ভারতীয় সভ্যতায় ভগবান শ্রীরামের সাথে তুলনীয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি যোগদান করেছিলেন আর তখন তাকে শ্বেত বর্ণের ছত্র উপহার দেওয়া হয়েছিল, যা কিনা আজ ও ত্রিপুরার রাজ বংশের এক প্রতীক। মহাভারত মহাকাব্যে যে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা উল্লেখিত আছে তাকে অনেক ইতিহাসকারগণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত বর্তমান ত্রিপুরী বা তেওয়ার গ্রামকে চিহ্নিত করেন। মধ্যপ্রদেশের এই ত্রিপুরি রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে এই রাজ্য খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম ও ও দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিল আর অন্য দিকে মহাভারতের যুদ্ধকাল ছিল ৩১৫২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। কি করে ৩০০০ বছরের অধিক ব্যবধানের দুটি ঐতিহাসিক রাজ্য এক হতে পারে তা ঐ সকল তথাকথিত ঐতিহাসিকগনই বলতে পারবেন। খ্রিষ্টীয় ৬২৪ সনে চিনের মহান পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন কামরুপ রাজ্যে ভ্রমণ করেছিলেন তখন তার বিখ্যাত ভ্রমন কাহিনীতে কামরূপ রাজ্যের পূর্ব দিকে 'তলোপতি' নামে এক রাজ্যের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই তলোপতি রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্য হতে পারে না। চিনের ভাষায় 'র' উচ্চারন নাই, তাই 'র' স্থানে 'ল' ও 'ত'

উচ্চারিত হয়েছে।

এত প্রাচীন রাজ্য সম্ভবত ভারতে অদ্বিতীয়। কিন্তু ত্রিপুরার কিছু লেখক ও অনেক মৌসুমী প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিকগণ ত্রিপুরার রাজ বংশ তথা ইতিহাসকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে বলে তাদের এই অভিমত বিভিন্ন বই ও পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এই ভাবে বিকৃত করে ইতিহাস লিখে তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ত্রিপুরার রাজাদের উপহাস করতে গিয়ে নিজেদের সততা ও জ্ঞানেরই উপহাস করে বসেছেন। সত্যকে কিছু সময়ের জন্য মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, একটি জাতিকে কিছু বছরের জন্য অন্ধকারে ঢেকে রাখা যায় কিন্তু চির কালের জন্য সম্ভব নয়। যেখানে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিহাসের বই গুলিতে হিন্দু রাজা মহারাজা ও সম্রাটদের জন্য একটা স্তবক বা এক পাতায় জায়গা পায় সেখানে মোঘল বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস এক একটি অধ্যায়ে লিখা হয়। এই অবস্থায় ত্রিপুরার ইতিহাসকে যে হেয় করে দেখানো হবেনা, তাতে আর বিচিত্র কী!! শুধু ঐতিহাসিকগনই নয়, এই পাপ কর্মে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা গনও কোন অংশে পিছু নন। হাজার হাজার বছর ধরে ত্রিপুরার রাজারা যে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তা আজ অনেকে দেখেও দেখছে না। এখনো প্রতিটি জনসভা, মেলা এবং সাংস্কৃতিক মিলন স্থলে রাজাদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা ও নানাহ সমালোচনা প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছে। অথচ এই সব বক্তারা একটিবারও চিন্তা করে দেখে না যে মাটিতে দাড়িয়ে ত্রিপুরার রাজাদের সমালোচনা করছেন, যদি ত্রিপুরার ঐ রাজা মহারাজারা না থাকতেন তাহলে তাদের বাক স্বাধীনতা তো দূরের কথা তাদের অস্তিত্বই থাকতো না।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ত্রিপুরী জাতি তথা ত্রিপুরার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের রক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের জন্য অহরহ ত্রিপুরাসুন্দরী মাতার সেবায় নিয়োজিত। এই লক্ষের সাধনে একটি পদক্ষেপ হিসাবে এই পুস্তকটির প্রকাশনা করা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ ইতিহাসের বিকৃতিকরণের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য ও প্রমান সহকারে পুস্তকটির রচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরার সর্বশেষ নৃপতি মহারাজ

বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ছিলেন আধুনিক, অত্যন্ত দূরদর্শী এবং জনপ্রিয় বিশ্বনেতার সমাধিকারী ব্যক্তিত্ব। ত্রিপুরাবাসীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইংরেজ ব্রাউন সাহেব কে শিক্ষা সচিব নিযুক্ত করেছিলেন এবং ৪০০ এরও অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য মহাবিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও হৃদয় বিদায়ক বিষয় যে সেটা বাস্তবায়ন করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য তিনি ত্রিপুরার সংবিধান এবং গ্রাম্য মন্ডলী আইনের রচনা করিয়েছিলেন। ত্রিপুরীদের রীতিনীতি, আচার বিচার, সমাজ, সংস্কৃতি, পূজা প্রার্থনা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিকে সংস্কার করে আধুনিক করার জন্য এবং প্রচার প্রসার করার জন্য তিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ গঠন করেছিলেন এবং সমগ্র পার্বত্য প্রজার আর্থ সামাজিক কাঠামো রক্ষার জন্য এগারো হাজার দ্রোণ জমি সংরক্ষণ করেছিলেন। আর পঞ্চ ত্রিপুর সংঘ নামে পার্বত্য প্রজাদের সামাজিক সংস্থা গঠন করেছিলেন। ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ত্রিপুরার এই মহান মহারাজার জীবনের সঠিক মূল্যায়নের উদ্দ্যেশে একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার তেজস্বী যুবক ডাঃ সৌরিশ দেববর্মন যিনি পেশায় একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন তাকে এই বই লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনিও স্বতস্ফূর্ত ভাবে বইটি লিখতে রাজি হয়েছেন। তার জন্য উনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি এতে ত্রিপুরার সত্যিকারের ইতিহাস উন্মোচিত হবে। পুস্তকটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার সম্পূর্ণ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়িত করা হবে।

যোগেন্দ্র দেববর্মা
সভাপতি, ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ

।। ভূমিকা ।।

আমরা "ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের" এর পক্ষ থেকে সব সময়েই চেয়েছিলাম যে মহারাজা বীরবিক্রম বিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জীবনী নিয়ে একটা কিছু লেখা হোক। মহারাজ বীর বিক্রম ছিলেন এক প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশের শেষ স্বাধীন নৃপতি যার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদার দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষের এই অঞ্চলকে সনাতন সংস্কৃতির অভয়ারণ্যে পরিণত করে তুলেছিল অসামান্য বিবিধতার মাঝেও। অথচ এখনও তিনি তাঁর প্রাপ্য যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত। আজ ত্রিপুরায় যে নব্বই শতাংশের অধিক হিন্দু জনগণের বাস তার কারণ কিন্তু তিনিই। প্রথমেই "সনাতন ভারত গৌরব ঐতিহ্যময়ী ত্রিপুরা" নামে ঐতিহাসিক দলিল সমৃদ্ধ বইটি লেখার জন্যে ডাঃ সৌরিশ দেববর্মন মহোদয় কে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখক একজন ঠাকুর পরিবারভূক্ত সুশিক্ষিত সজ্জন ব্যাক্তি। পেশায় একজন বিশেষঞ্জ চিকিৎসক এবং আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনারত। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ত্রিপুরাবাসী তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে এত সুন্দর তথ্য সম্বলিত বইয়ের রচনা করেছেন তা অবশ্যই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সহায়তা করবে।

বর্তমান ভারতে সনাতনপন্থী যত সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে অবশ্যই ত্রিপুরীরা প্রাচীনতম। মাণিক্য উপাধিধারী ত্রিপুরী রাজারা বহু শতাব্দী ধরে উত্তর পূর্ব ভারতে রাজত্ব করে গেছেন। আজকে শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রামে যে মন্দিরগুলী সনাতনী সংস্কৃতির স্মৃতিস্বরুপ অক্ষত আছে, তা কখনও সম্ভব হত না যদি না ত্রিপুরী মাণিক্য রাজারা মুসলমান সুলতানদের পরাজিত করে মেঘনার পূর্বপাড় পর্যন্ত অত্র অঞ্চল নিজ দখলে রাখতেন। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, যে জাতি সহস্র বছরের প্রাচীন সনাতনী ঐতিহ্যকে সাত দশক আগেও সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পেরেছিল, তাদের অস্তিত্ব আজ সংকটে। বিগত সাত দশক ধরে এই রাজ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যে অশুভ শক্তিগুলী কাজ করতে শুরু করেছিল, তার ফলস্বরুপ আজ দেখা যাচ্ছে রাজন্য বর্গের বীরগাথা, ইতিহাসকে বিকৃত করে পরিবেশন করা, রাজন্য

আমলের শাষন ব্যবস্থার উজ্জ্বল জনকল্যাণমূলক ইতিহাসকে নস্যাৎ করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাষন ব্যবস্থার নামে বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সবকিছুকে সীমাবদ্ধ করে রাখা। আরও আশ্চর্য হবার কথা যে ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত জনজাতিদের জন্যে স্বতঃসিদ্ধ ধারা বা কাস্টমারি ল' কে প্রথমেই নিঃষ্ক্রীয় করার লক্ষ্যে পাড়া-হাংকর-চৌধুরীর শাষন ও বিচার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। আজ ত্রিপুরীদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাভাবের সৃষ্টি হয়েছে—এর জন্যে দায়ী কে? বিদগ্ধ পাঠক সমাজের কাছে নিরপেক্ষ বিচারের জন্যে অনুরোধ রাখছি। বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে অত্র অঞ্চলে এবং অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং আসামের ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে কোনো জাতিগত দাঙ্গা বা উল্লেখযোগ্য ধর্ম উচ্ছেদের ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান, ককবরকভাষী, বাংলাভাষী, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে সহবস্থান করেছিল। রাজতন্ত্রের পরন্ত বিকেলে একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়, অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যা পরবর্তীকালে দ্বিজাতি তত্ত্বের নিরিখে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রুপ নেয়। যার প্রভাবে নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলিম ভয়ংকর দাঙ্গা বাধে। প্রায় সাড়ে চারলক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুরা সমতল ত্রিপুরা থেকে মহারাজ বীরবিক্রমের ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় এবং তখন আগরতলার বর্তমান ক্যাম্পের বাজারের সৃষ্টি হয় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে। তাঁর মহানুভবতা, বীরতা, ক্ষমাপরায়ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মানবতাবাদীতার প্রমান আমরা বার বার পেয়েছি। অথচ আজ আমরা অকৃতজ্ঞের মত তাঁর সব ঐতিহ্যকে ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস করে চলেছি। যে রাজপ্রাসাদে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই রাজবাড়ীর সিংহদ্বারের সম্মুখে স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি বসানোর অর্থ কী?

এটা কী মূল ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা নয়? এইভাবে কী ক্ষদিরাম বসু এবং মাস্টারদা সূর্যসেন কে অপমান করা হয়নি অন্যের অধিকারে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে?? আর যারা শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী তাদেরই বা কেন এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতার আশ্রয় নিতে হল!! এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্যই পর্যালোচনা করা দরকার। বর্তমানে ত্রিপুরী সমাজ খুবই বিপন্ন অবস্থায় আছে। একে তো দেশবিভাগের

ফলস্বরুপ নিজ রাজ্যেই সংখ্যালঘুতে পরিণত অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সংখ্যাধিক্য বিশাল ফেক্টর। সময়োপযোগী সবার কল্যাণের নিরিখে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার তা ঐ কারনে নেওয়া যায় না। কোন পিছিয়ে পরা জাতির উন্নতি তাঁর ভাষার অগ্রগতি দিয়েই শুরু হয়। ত্রিপুরীদের মাতৃভাষা ককবরক কে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। আর ২০১৫ তে তার ডাইরেক্টরেট খোলা হয়। একটি ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিপূর্ণতা আনতে হলে যে আলাদা ডাইরেক্টরেটের প্রয়োজন তা বুঝতে সময় লেখেছে ৩৭ বছর। তাহলে বুঝুন আসলে সদিচ্ছা কতটুকু! আরেকটু পিছনের দিকে যদি তাকাই তা হলে বলতে হয় ১৯৪৪ সাল থেকেই গ্রাম ত্রিপুরার রাজন্য আমলের পঞ্চায়েতিরাজকে ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। ত্রিপুরীদের দুর্বেধ্য সমাজ ব্যবস্থাকে না ভাঙ্গলে গ্রামের নিরীহ সাদামাটা লোকজনদের তথাকথিত ব্যাতিক্রমী কাজে যে লাগানো যাবে না। এটাকে মাথায় রেখেই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি পর্যায়ক্রমে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। মহারাজ একাধিকবার বিদেশ ভ্রমনে গিয়েছিলেন। প্রথমবার ইয়োরোপ থেকে ফেরার পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ত্রিপুরী জাতিকে সংগঠিত করতে হবে আর সমাজ হচ্ছে তার মূল আধার। ১৯২৮ সালে তাঁর রাজ্যাভিষেকের বছরেই "ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ" নামে সভার প্রতিষ্ঠা করেন মূলত ত্রিপুরীদের কৌলিকক্রিয়াকলাপ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে। আর কার্যকরী করা হয় ১৯৩২ সাল থেকে। প্রথমেই ত্রিপুরী জাতির ৭টি হাংকরকে ২৫টি মন্ডলীতে ভাগ করা হয়। এরপরেই তিনি রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, পুরান ত্রিপুরী, দেশী ত্রিপুরাদের মিলে পঞ্চত্রিপুর ক্ষত্রিয় নাম দেন। পঞ্চাশটি মন্ডলীর প্রত্যেকটিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে মনোনীত নয়জন সর্দার ও দশজন ভলান্টিয়ার থাকতো। আর সারা রাজ্যব্যাপী পঞ্চাশটি মন্ডলের কাজকর্ম ইত্যাদি দেখাশুনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রধান সভা গঠিত হয়। এই সভাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিন সদস্যের উপদেষ্টা মন্ডলী এবং ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর যখন ভারতের সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন সেখানে জনজাতিদের প্রথাগত সামাজিক প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি

দেওয়া হয়েছিল। অথচ ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক সরকার এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে সময় নিয়েছে দশকের পর দশক। তাও সমভাবে হয়নি। এখানেও ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি। ককবরক গোষ্ঠীর মূল অংশকে অবজ্ঞা করে বাকীদের কাস্টমারি ল কার্যকারীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। যে কোন রাষ্ট্রের অধীনস্ত রাজ্য কীভাবে একই আইন কার্যকরীর জন্যে একই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে দুরকমের ব্যবস্থা নিতে পারে। এর থেকে কী এটা প্রমাণিত হয় না যে কত সুচারুভাবে ত্রিপুরীজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকার তার জুরিসডিক্‌শনের আওতায় বিশেষ কোন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ নীতির মাধ্যমে তাকে যদি দুর্বল করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ কী শাস্তি পাবার যোগ্য নয়? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এমন কর্ম করা কী রাষ্ট্রগর্হিত কাজ নয়। অন্য আর এক বিদেশী শক্তি আমাদের জাতি গোষ্ঠী পরিবারের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল, তারা হল খ্রীষ্টান মিশনারীরা। গত অর্ধশতাব্দী ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন উনারা। তারা শান্তির বাণী প্রচারের নামে যে বিষবৃক্ষ বপন করেছিল আমাদের মধ্যে, তার ফলস্বরুপ আজ ত্রিপুরীদের মধ্যে ধর্মীয় দিক দিয়েও বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এর বিষময় ফল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ভাইদের মধ্যে মৃত মাতা পিতার সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে বিবাদ। ১৯৫৭-৫৮ র দিকে কেরেলিয়ান মিশনারীদের সঙ্গে সাদা চামড়ার লোকজনও ছিল। তারা ত্রিপুরী পল্লীতে গিয়ে বলত যে চৈতন্য মহাপ্রভু বাঙালী কাজেই এই ধর্ম তোমাদের নয়। তোমাদের পরিত্রাতা হচ্ছে যীশু!! কিন্তু যীশুর আর্শীবাদ পেতে হলে তোমাদের গৃহবেতা মাইলুমা খুলুমা কে ফেলে দিতে হবে। কোন শয়তানের পূজা করা চলবে না। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অতি ধার্মিক ত্রিপুরীরা নরক ভোগ করতে চায় না। তাই বিধর্মী হয়ে অতলান্ত নরক পথের যাত্রি হচ্ছেন। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি অগ্রসর হতে পারে না, এই কথাটি সর্বজনবিদিত। আর অনুপযুক্ত লোক দিয়ে কোন জাতি কে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস করা হলে, তবে সে জাতি কোন পারমনবিক বোমা ছাড়াই ধ্বংস হতে বাধ্য। ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকার সিংহদ্বারে লেখা রয়েছে যে— "কোন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমানবিক হামলা বা ক্ষেপনাস্ত্রের দরকার নেই। বরং

সেই জাতির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রতারণার সুযোগ দিলেই হবে। কারণ এভাবে পরীক্ষা দিয়ে তৈরী হওয়া ডাক্তারদের হাতে রোগীর মৃত্যু হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা দালান কোঠা, ইমারত ধ্বংস হবে, এবং অর্থনীতিবিদদের দ্বারা দেশের আর্থিক খাত দেউলিয়া হবে। এছাড়া বিচারকদের হাতে বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরার মানে হল একটি জাতির অবলুপ্তি।" অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে এই ধরনের শিক্ষা গ্রাম পাহাড়ের ত্রিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। সুতরাং এই সমাজে দৃষ্ট এত উশৃঙ্খলতা, উদ্ভ্রান্ত অপরিনামদর্শী চঞ্চলতা, সব কিছুই কিন্তু ক্ষণকালের ফসল নয়। একটা সুবিধাবাদী বিদেশী ষড়যন্ত্র যেভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছে; ওদের ফল পাওয়া শুরু হয়েছে। লেখক অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরুপে মহারাজ বীরবিক্রমের চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহারাজ বীরবিক্রম যে কত দূরদর্শী ছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় জাগে। অথচ আজকে আমরা আত্মবিস্মৃত। পরের কথায় সবভুলে আছি জীবন্মৃত অবস্থায়। কোন প্রতিবাদ নেই জড় পদার্থের মত। এর পরেও আজকে আমার গর্ব বোধ হয় কেননা আজ মহারাজের গঠন করা "ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডলী"-র আমিও একজন। আমি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার সকল অংশের কাছে আহ্বান রাখছি— আসুন আমরা সবাই মিলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় মহারাজ বীরবিক্রম দ্বারা প্রদর্শীত পথে অগ্রসর হই এবং তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত এই রাজ্যকে আরও সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলি।

"জয় ত্রিপুর ক্ষত্রিয় কী জয়"

বিশ্বজিৎ দেববর্মা
সাধারণ সম্পাদক,
ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ,
আগরতলা, ত্রিপুরা,

সূচীপত্র

ত্রিপুরার ইতিহাসের পৌরাণিক দিক্

ত্রিপুরার ইতিহাস নানা রকম অনভিজ্ঞ চর্চায় আজ অভিশপ্ত। ইতিহাস চর্চায় আজ নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই বিশৃঙ্খলার অছিলায় উদ্ভট সব নিত্যনতূন তত্ত্বের উঠে আসা যেন, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নানারকম পৌরাণিক সাহিত্যের নিদর্শন, যাকে ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করা কঠিন, তাকে আমরা যেন দেখেও দেখছি না। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বলিত "রাজমালা" নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। আমাদের রাজ্যের অনেক ব্যক্তিই কৈলাসচন্দ্রের 'রাজমালা'-র বিবরণ অনুসারে ত্রিপুরার ইতিহাসকে তুলে ধরতে চান। কৈলাস বাবুর রাজমালার বক্তব্য গ্রহণ করার পেছনে যে একমাত্র যুক্তি প্রস্তুত করা হয়, তা হলো এই যে উক্ত পুস্তক রাজ আদেশে রচনার গ্লানি থেকে মুক্ত। তবে কৈলাশবাবুর হঠাৎ রাজমালা রচনার পেছনে কোন স্বার্থ কী কাজ করেনি? তিনি কী ত্রিপুরা হিতৈষী ছিলেন? কৈলাস বাবু সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় এবং যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার পর তিনি রাজমালা রচনা করতে ব্রতী হন, সেই অপ্রিয় প্রেক্ষাপট বিচার করলে মনে হয়, একটা নেতিবাচক মানসিকতা সবসময়ই কাজ করেছিল উনার রাজমালা রচনার পেছনে। যাই হোক না কেন একটা কথা সত্য যে তিনি কখনও ত্রিপুরা হিতৈষী ছিলেন না। নতুবা সব বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে পরিত্যাগ করতেন না। ইতিহাস আলোচনায় এতসব কথা না বললেও হতো, তবুও ভবিষ্যৎ গবেষকদের এই দিকটিও বিচার করতে হতে পারে, এই ভাবনায় এত সব কথার অবতারণা। ত্রিপুরা নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ খোঁজার

চেষ্টা করতে গিয়ে অককবরকভাষী কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেছেন যে ত্রিপুরী ভাষায় 'তৌয়' মানে জল ও 'প্রা' মানে নিকট, এই দুটি শব্দের মিশ্রনে 'তৌয়প্রা' নামক শব্দ থেকেই নাকি ত্রিপুরা নামটির সৃষ্টি। কিন্তু ককবরকের ব্যাকরণ অনুসারে এমন কোনও শব্দই ককবরকে আজও দেখা যায়নি। এছাড়াও ত্রিপুরায় কত নদী, নালা,
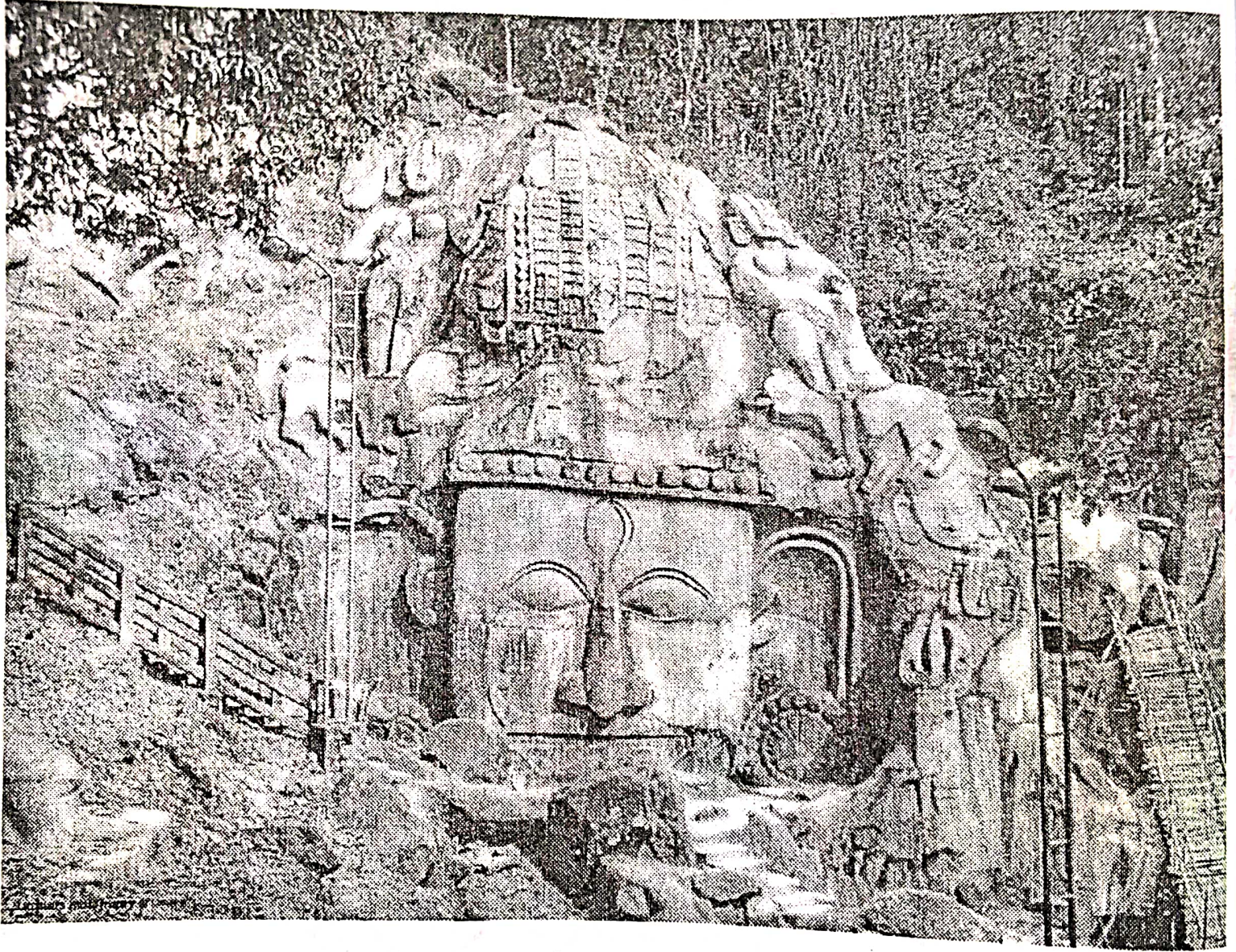
ঊনকোটিশ্বর কালভৈরব, ঊনকোটি, ত্রিপুরা

ছড়া আছে তা সত্যেও কোনওরকম লোকগাঁথা বা দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী এই ধরণের শব্দ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রথমত 'প্রা' নামে কোনও শব্দই ককবরকে নেই। তবে 'বুপ্রা', নামক শব্দ আছে যার অর্থ ভাগ হয়ে যাওয়া। যেমন লামপ্রা, বুপ্রা। লামা অর্থাৎ পথ এবং বুপ্রা যদি লামার পরে লাগানো হয় তবে সেটা দাঁড়ায় লামাবুপ্রা। কিন্তু ককবরক উচ্চারণ শৈলীতে সেটা দাঁড়ায় লাম্প্রা অর্থাৎ এমন কোনও জায়গা যেখান থেকে পথ দুভাগ হয়ে গেছে। তেমনি 'বুফাঙ' মানে

গাছ এবং 'বুপ্রা' বুফাঙ শব্দের পরে লাগালে দাঁড়ায় 'বুফাঙবুপ্রা'। আবারো বুফাঙবুপ্রা বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো শুধু 'বুপ্রা' মানে গাছের ডাল। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'প্রা' কথার মানে নিকট নয়। অনেকে হয়তো বলবেন যে প্রাচীন ত্রিবেগ ব্রহ্মপুত্র ও কপিল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল বলে এই ধরণের শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেখানে কপিল নদী ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদী (tributory), বিভাজিত শাখা বা distributory নয়। এছাড়াও সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে এমন কোনও নদ নদী নেই যা দুভাগ হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতেও তীর্থমুখে রাইমা ও সরমা নদীর মিলনের ফলে গোমতী নদীর সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি তীর্থমুখের ঐ সঙ্গমস্থলকে কখনো তুইপ্রা বলে ককবরকভাষায় সম্বোধন করতে দেখা যায়নি। তাহলে এই ধরণের মনগড়া একটা শব্দকে নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো কী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হিতে হবে? হয়তো কেউ কখনও এই দিকটা ভেবেও দেখেননি বা ভাবতেও চাননি। তবে 'তৌয়প্রা' না হলেও তিপ্রা শব্দটি আছে, যার দ্বারা ত্রিপুরী জাতি পরিচিত। এখন এই 'তিপ্রা' শব্দটি থেকেই কী ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি না ত্রিপুরা শব্দটি থেকে অপভ্রংশিত হয়ে 'তিপ্রা' শব্দটির সৃষ্টি তা প্রমানসাপেক্ষ গবেষণা করে দেখা উচিত। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালা পাঠে জানা যায় যে কালের আগোচর কাল থেকেই প্রাচীন কিরাত দেশ অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরার প্রাচীন নাম যা গ্রীক পর্যটক টলেমির 'পেরিপ্লাস অব ইরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত, তা পরে 'ত্রিপুরা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রায়শই নানারকম লেখায় দেখা যায় যে অধার্মিক অত্যাচারী মহারাজ ত্রিপুরের নামানুসারে 'ত্রিপুরা' রাজ্যের নামকরণ হওয়া অসম্ভব। কারণ ইতিহাসে রাজ্যের নামানুসারেই রাজকুমার রাজকুমারীদের নামকরণ হতে দেখা যায় যেমন— গান্ধার প্রদেশের রাজকুমারী গান্ধারী, পাঞ্চাল প্রদেশের রাজকুমারী পাঞ্চালী ইত্যাদি। অতএব প্রাচীনকালের নামকরণের এই প্রথার অনুসরণেই মহারাজ দৈত্য স্বীয় পুত্রের নামকরনও ত্রিপুর রেখেছিলেন যা রাজরত্নাকরেও দেখা যায় যেমন—

"মাণ্ডব্যা গর্ভ সম্ভূতঃ পুত্র একো ধরাপতে।
বভূব ত্রিপুরায়স্ত জননা ত্রিপুরেশ্বরং।

নামচক্রে মহারাজ রাজ্যা নামনুজরেতঃ।”

—রাজরত্নাকর দক্ষিণ বিভাগ, ২য় অধ্যায়।

তার মানে মহারাজ ত্রিপুরেরও পূর্বে ত্রিপুরা নামটি রাজ্যের নামানুসারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং উপরিউক্ত শ্লোক থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে রাজ্যের নামানুসারেই রাজ্যের রাজপুত্রের নাম রাখা হয়েছিল।

ত্রিপুরা নামকরণের পেছনে যে আর্যপ্রভাব আছে তা বলাবাহুল্য। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে আর্য, কিরাত ও দ্রাবীড়িয় সভ্যতার আদান প্রদান প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে। বর্তমান হিন্দু ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাচ্ছে, যে হিন্দু ধর্মও উপরিউক্ত তিন সভ্যতার নানারকম কৌলিক প্রথার সংমিশ্রণে উদ্ভুত। হতে পারে, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন ধরণের ধর্মানুশাসনের চর্চা বর্তমানে ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এই তিন তন্ত্রের সমন্বিত সাধন প্রণালীই “ত্রিপুরাতন্ত্র”, নামে পরিচিত। পরশুরাম কল্পসুত্র থেকে ত্রিপুরাতন্ত্র সম্পর্কে জানা যায়। অতএব হয়তো এই ত্রিপুরাতন্ত্র থেকেই ত্রিপুরা নামটি এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হান্টার সাহেব আবার বলেছেন যে হতে পারে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল বলেই দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী হয়েছে। এর প্রমান স্বরুপ পীঠমালা তন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামনি নামক অতি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থেও ত্রিপুরার নাম দেখা যায় যথা।

“ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরব ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ।”

—পীঠমালাতন্ত্র

এবং “ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
ভৈরব ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ট ফলপ্রদঃ।”

—তন্ত্র চূড়ামনি।

অনেকেই মহাভারতে বর্ণিত ত্রিপুরাকে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা বলে মানতে চান না। হয়তো ভ্রমে পতিত হয়েই, গভীরভাবে অনুসন্ধান না করে এই মত প্রকাশ

করা হয়েছে। ই. এফ. স্যান্ডিজ মহাশয় প্রণীত 'হিস্ট্রি অব ত্রিপুরা' নামক গ্রন্থটি পাঠ করলে জানা যায় যে মহাভারতে ত্রিপুরা রাজ্যকে হিমালয়ের পাদদেশে ভারতবর্ষের পূর্বদিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায়, যখন কর্ণের পূর্বাভিমুখে দ্বিগবিজয়ে বিজিত রাজ্যগুলির নামের মধ্যে ত্রিপুরাকে দেখতে পাই। যথা—
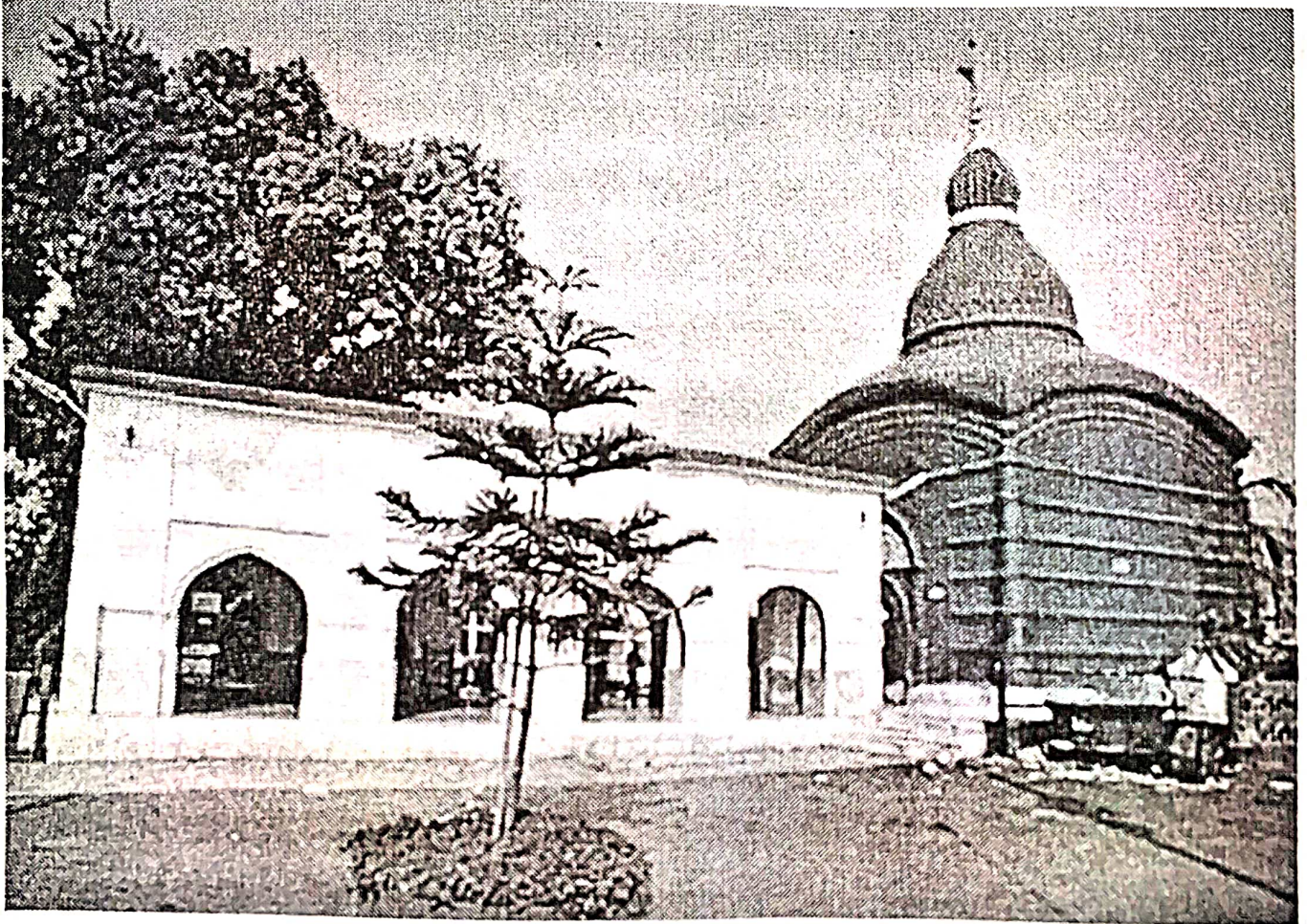
পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী, উদয়পুর ত্রিপুরা

"পূর্বা দিশা বিনির্জ্জিত্ব বভূতমিং স্তথাগমত।
বৎসভূমিং বিনির্জ্জিত্ব কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন,
পত্তণ ত্রিপুরাং কৌশলাং তথা।
এতান সর্ব্বান বিনির্জ্জিত্ব করমাদায় সর্বংশঃ।
দাক্ষিণাং দিশামাস্থায় কর্ণো জিত্বা মহারথান।।"

এখন যদি কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর (বর্তমান দিল্লী) থেকে পূর্ব দিকে তাকাই তাহলে উপরিউক্ত শ্লোকে বর্ণিত রাজ্যগুলিকে আমরা ভারতের পূর্ব প্রান্তেই দেখতে পাই যার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থান যথেষ্ঠ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহলে দক্ষিণাপথের ত্রিপুরীকে (জব্বলপুরের নিকট) তো কোনওভাবেই পূর্বদিকে স্থান দেওয়া যাচ্ছে না। আর দক্ষিণাপথের ত্রিপুরীকে যদি স্থান দিতেও হয়, তবে তো দেখছি ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থানটাকেই মিথ্যা বলতে হয়। যাই হোক উপরিউক্ত শ্লোকে যে বৎসভূমির কথা বলা হয়েছে তা ইংরেজী করলে দাঁড়ায় 'grazing land' অর্থাৎ গোচারণ ভূমি এবং এই গোচারণ ভূমি বলতে অনন্ত সলিলা পুষ্ট গাঙ্গেয় মোহনা অঞ্চলকেই বোঝানো হয়েছে। উপরিউক্ত মৃত্তিকাবর্তী, মোহন ও পত্তন আসলে বাংলাদেশেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব রাজ্য। একশো বছর আগেও চাকলা রোশনাবাদ অন্তর্গত ব্রাহ্মনবাড়িয়া অঞ্চলকে ত্রিপুরার জমিদারীতে 'পত্তন' বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন ত্রিপুরার সঙ্গে কোশল দেশের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায়। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর উপরিউক্ত শ্লোকেই দেওয়া আছে। শ্লোকে বর্ণিত কোশল রাজ্য হলো তৎকালীন ভারতবর্ষের দক্ষিণ কোশল রাজ্য। এই দক্ষিণ কোশল রাজ্যের অবস্থান বর্তমান ভারতবর্ষের ভূগোল অনুসারে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও ছোটানাগপুর মালভূমি অঞ্চল। শ্লোকে বলা হয়েছে পূর্বদিকে অবস্থিত একে একে রাজ্যগুলিকে জয় করে কর্ণ কোশল রাজ্যে উপস্থিত হলেন ও তারপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে কর্ণ দ্বারা পূর্বদিকে বিজীত রাজ্যগুলিকে যদি ক্রমানুসারে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে সাজানো যায়, তাহলে সবচাইতে পূর্বদিকে আমরা ত্রিপুরাকেই দেখতে পাই। শ্লোকে এও বলা হয়েছে ত্রিপুরা জয়ের পরেই, কৌশল রাজ্য জয় করে কর্ণ দক্ষিশদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাহলে জব্বলপুরের ত্রিপুরী যা মধ্যভারতে অবস্থিত এবং হস্তিনাপুর অর্থাৎ বর্তমান দিল্লী থেকে যা সোজা নাক বরাবর দক্ষিণে অবস্থিত, তা কিভাবে পূর্বভারতের ত্রিপুরা হলো। তবে কি মহাভারতকালীন যুগে দিক্ নির্ণয় প্রক্রিয়া ভুল ছিল? আর যখন ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন বৎসভূমি-র কথা বলা হয়েছে তা পাথুরে শুকনো জব্বলপুর এলাকা না হওয়াই (ভূপ্রাকৃতিক বিজ্ঞান

অনুসারে) স্বাভাবিক। মহাভারতের রচয়িতা মহাঋষি ব্যাদব্যাসের আরেক অন্যতম অমর সৃষ্টি ভবিষ্য পুরাণেও ত্রিপুরার উল্লেখ দেখতে পাই। যথা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্বম মনিপুরকম্
লৌহিত্য স্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম।।'

বরেন্দ্র অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা অঞ্চল, তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক, হেড়ম্ব মানে আধুনিক কাছাড়, মনিপুর অর্থাৎ বর্তমান মনিপুর রাজ্য, লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ অঞ্চল, জয়ন্তা অর্থাৎ জয়ন্তীয়া রাজ্য যা বর্তমান মেঘালয়ের জয়ন্তীয়া পাহাড়ী অঞ্চল। এই সব রাজ্যের সঙ্গে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের নাম নেওয়া হয়েছে, তার পরেও কী আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে মধ্যভারতের ত্রিপুরী বলে ভাবব? এখানে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না, যদিও তা এই আলোচনার বিষয়বস্তু না, তবুও অপ্রাসঙ্গিক নয়। মহাভারতের আরেক চরিত্র জৈমিনী ঋষি রচিত 'জৈমিনী ভারত' গ্রন্থে আমরা পান্ডবদের উত্তর পূর্ব ভারতে আগমনের উল্লেখ দেখতে পাই। 'জৈমিনী ভারত' ২১শ অধ্যায় ও ২২শ অধ্যায়ে অর্জুনের 'স্ত্রীরাজ্য' গমন ও যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পুরাণ মতে ও কলহনের মতে জয়ন্তীয়া রাজ্যকে 'স্ত্রীরাজ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জৈমিনী ভারতেই আমরা দেখতে পাই অর্জুন 'স্ত্রীরাজ্য' থেকে পার্শ্ববর্তী মনিপুরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই যারা মনে করেন মহাভারতের মনিপুর ও উত্তরপূর্ব ভারতের মনিপুর এক নয়, তাদের ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরায় পর্যালোচনা করা দরকার। অর্জুনের মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ আসলে এই অঞ্চলে আর্য ও ইন্দো মঙ্গোলয়েড জাতির সামাজিক আদান প্রদানের কথাই বলা হয়েছে যা নানা ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে খুবই স্বাভাবিক। তাই যারা মনে করেন উত্তরপূর্ব ভারতের ইন্দো মঙ্গোলয়েডদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাদের ভাববার অবকাশ আছে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে রচিত গুহ্য তন্ত্র ও কামাখ্যা তন্ত্রে ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গুহ্যতন্ত্রে উল্লিখিত শ্লোকটি যথা—

"ত্রিপুরোত্তরা ভাগ চচা যবত সিদ্ধেশ্বরা হর।
পশ্চিমা চন্ডিকা কুন্ডম পূর্বে কুন্ডম সুধাময়ম।"
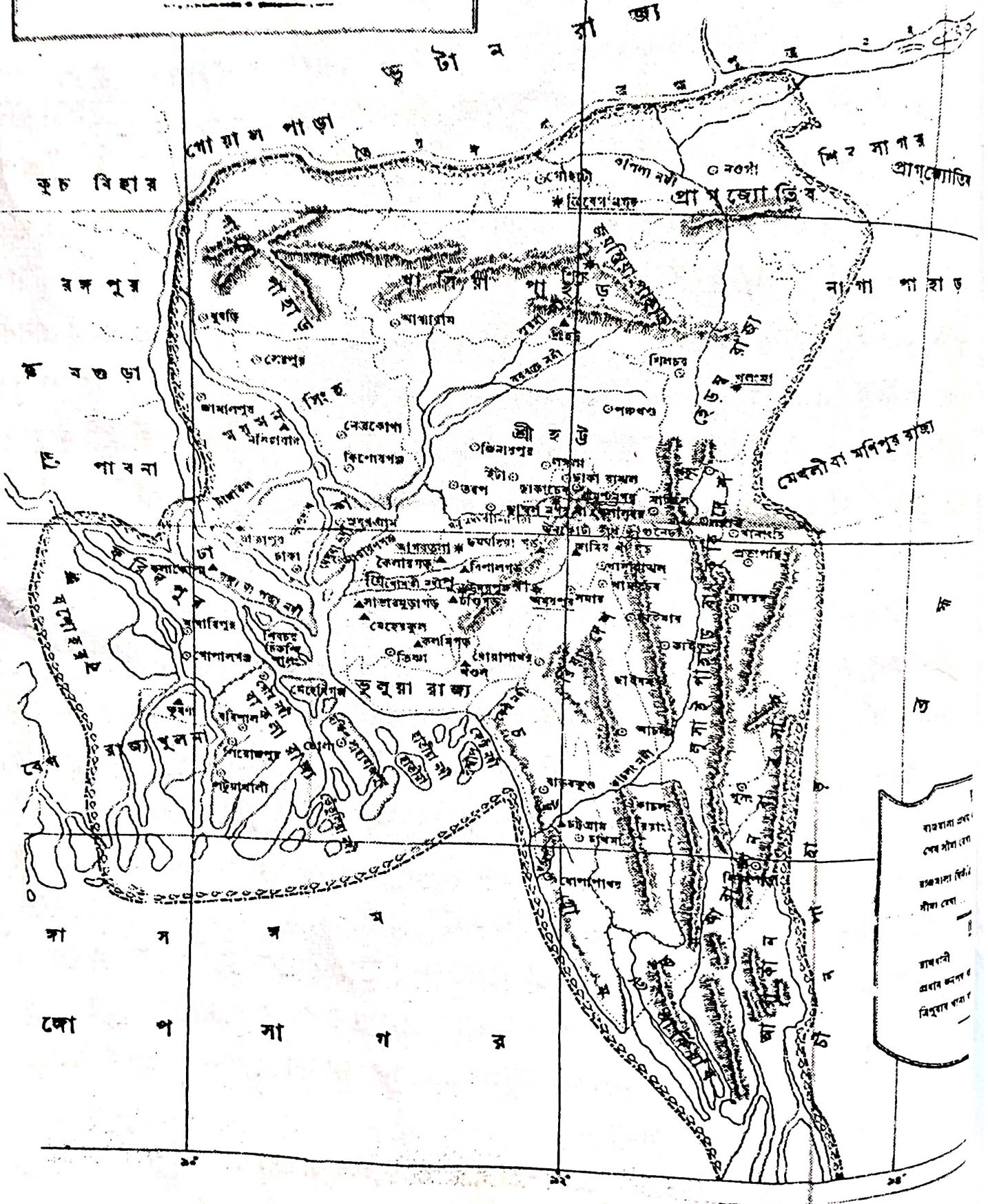
মহারাজা বিজয় মাণিক্যের সময় ত্রিপুরার মানচিত্র

এবং কামাখ্যা তন্ত্রে বর্ণিত শ্লোকটি হলো—

"ত্রিপুরা কৈকিকা চৈব জয়ন্তী মনি চন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মগধী দেবী অশ্বীনি সপ্ত পর্বতঃ।।"

উপরিউক্ত শ্লোকে ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চলের বর্ণনা করা হয়েছে যেমন কৈকিকা অর্থাৎ কুকি রাজ্য, জয়ন্তী অর্থাৎ জয়ন্তিয়া রাজ্য, কাছাড় সুপরিচিত, মগধী হলো শ্রীহট্টের এক প্রাচীন রাজ্য।

এছাড়াও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ মিহির সংহিতাতেও ত্রিপুরা রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"আগ্নেয়্যাং দিশি কোশল কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ,
কৈলিঙ্গ বিদর্ভ বৎসান্ধ্র চেদিকাশ্চোর্ধ কাঠাশ্চ।।
বৃষনালিকেয় চর্ম দ্বীপা বিন্ধ্যান্তবাসিন স্ত্রিপুরী।
শ্মশ্রুধর হেমকুট্য ব্যালগ্রীবা মহাগ্রীবাঃ।"

—বৃহৎ সংহিতা - ৪র্থ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

উপরিউক্ত শ্লোকে যে চর্ম দ্বীপের কথা বলা হয়েছে তা এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা পত্র Vol- XVIII তে জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্লোকে উল্লেখিত বিন্ধ্যগিরি কাছাড় ও শ্রীহট্টের পর্বতমালার নাম যা বরবক্র বা বরাক নদীর উৎপত্তিস্থল। তাছাড়া ব্যালগ্রীবা ও মহাগ্রীবাঃ হলো শ্রীহট্টের শক্তিতীর্থ। তাই বিন্ধশৈল, চর্মদ্বীপা, ব্যালগ্রীবা ও মহাগ্রীবার সঙ্গে বর্ণিত ত্রিপুরী কে বর্তমান ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবার কোন অবকাশ নেই। তবুও পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্য উপরিউক্ত শ্লোকের সমর্থনে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে। বায়ু পুরাণে আমরা বিন্ধ্যপর্বত ও বরবক্র নদীর উল্লেখ দেখতে পাই যথা— "বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্র, সপুন্যদঃ।" অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বত থেকেই বরবক্র বা বরাক নদীর উৎপত্তি। তাই এই বিন্ধ্যপর্বতকে কোনওভাবেই মধ্যভারতের বিন্ধ্যপর্বত বলে ভাববার অবকাশ নেই। উত্তর পূর্ব ভারতের কোনও পাহাড়ের নাম বিন্ধ্য হওয়ার পেছনে এই অঞ্চল যে পান্ডব বর্জিত ছিল না তা এর অকাট্য প্রমান। যাইহোক এখন শ্লোকের অপর অংশটি কেও দেখা যাক। শ্লোকে বর্ণিত ব্যালগ্রীবাঃ হলো

উপপীঠ যেখানে গ্রীবাংশ পড়েছিল। এবং এই উপপীঠও হলো শ্রীহট্ট যেখানে আমরা দেবীর নাম দেখতে পাই সর্ব্বেশ্বরী ও ভৈরব চর্চিতানন্দ। শ্লোকে বর্ণিত হেমকুট্য পর্বত হিমালয়ে অবস্থিত বলে ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন। তাই দেখা যাচ্ছে এই ভৌগলিক বিবরণে ত্রিপুরার অবস্থান সুস্পষ্ট যা এর প্রাচীনতাকেও প্রতিষ্ঠা করে।

পীঠমালা তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"শ্রী শৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষীস্তু দেবতা
ভৈরব সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।।"

নানা গ্রন্থে এই শ্রী শৈলকে শ্রীহট্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও শিবচরিতে এই শৈলকে দক্ষিণ ভারতে দেখানো হয়েছে কিন্তু সেখানে দেবী ও ভৈরবের নাম অন্য। এই শ্রী শৈল যে আসলে শ্রীহট্ট তার সবচাইতে বড় প্রমান শ্রীহট্ট শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গেলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে শ্রী শৈলের অপভ্রংশিত রূপই শ্রীহট্ট। তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সাধনমালাতে' চারটি মূল পীঠের কথা বলা হয়েছে তার অন্যতম হলো এই শ্রীহট্ট। বৌদ্ধতন্ত্রে এই পীঠের গুরুত্বকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

"গ্রীবা পপাতে শ্রীহট্টে সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী
দেবীতত্র মহালক্ষী সর্বানন্দশ্চ ভৈরব।"

পীঠমালা তন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামনি তে তো বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই বলা হয়েছে যার উজ্জ্বলতম প্রমান পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী। কীভাবে ও কেন এই অঞ্চলে ত্রিপুরা নামটি প্রচলিত হয়েছিল এই ব্যাপারে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তাই তুইপ্রা শব্দটির সঙ্গে ত্রিপুরা শব্দটির নৈকট্যতা থাকলেও, তুইপ্রা থেকেই ত্রিপুরা শব্দটির সৃষ্টি, এই মতের পক্ষে সদিচ্ছা থাকলেও প্রমান করার কোনও উপায় নেই। এতসব পৌরাণিক সাহিত্যের উপাদান ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থেও ত্রিপুরা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কন চন্ডী ও ক্ষিতীশবংশাবলী।

এই বিন্ধ্য শৈল যে উত্তর পূর্ব ভারতের বক্ষ জুড়ে অবস্থিত তা মর্ধ্য ভারতের

বিন্ধ্যপর্বত নয় তারও বহুপ্রমান পাওয়া যায়। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে কিরাতভূমির অবস্থান নিম্নোত্তরে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে—

"তপ্তকুন্ডং সমারভ্য রাম ক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধশৈলে হ বতিষ্ঠতে।"

উক্ত তপ্ত কুন্ড জয়ন্তীয়ার হরিপুর নামক স্থানেতে অবস্থিত। এই তপ্ত কুন্ডের আলোচনা Assam District Gazetteer Vol - II (Sylhet) Chap. III - p - 89 এ করা হয়েছে। রাজ রাজেশ্বরী তন্ত্রও শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের পরিপূরক—

"তন্ডুলানাং সমারভ্য রাম ক্ষেত্রোন্তরং শিবে।
কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্য শৈলান্ত গোমহান।"

শ্লোকে উদ্ধৃত রামক্ষেত্র বাংলাদেশের কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত রামু থানা। ভারতবর্ষে এক একটি রামক্ষেত্র এক একটি তীর্থ। এই অঞ্চলে রাম সীতার বনবাসকালীন আগমন উপলক্ষে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্য বা কপিলি রাজ্য যাকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের লাট প্রস্তর লিপিতে দবক রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলে প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য, এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা আজ একমত। কারণ চন্দ্রগুপ্তের শাষণকালে ঐ অঞ্চলে ত্রিপুরী রাজাদের ছাড়া অন্য কোনও রাজাদের শাষণ করার উপযুক্ত তথ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। রাজমালার সূত্র ধরে বিচার করলে বোঝা যায় শ্রীহট্টের খলংমাতে পঞ্চম শতাব্দীর আশেপাশে রাজধানী স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপর ধীরে ধীরে তারা নিম্নবঙ্গে রাজ্যপাট বিস্তার করেন। সময়ের নানা ঘাত প্রতিঘাতে এই প্রাচীন রাজ্যের নানা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের একটি জিনিষ দেখা খুবই জরুরী, যাতে আমরা কোনও রকম ভিত্তিহীন অপবাদ মূলক প্রচার না করি। না হলে এর ফল দূর্বিষহ হয়ে উঠবে।

“সনাতন ভারত গৌরব —ঐতিহ্যময়ী ত্রিপুরা”

ত্রিপুরা ভারতবর্ষের এক ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন রাজ্য। বিশ্বে একই বংশের অক্ষুন্ন ধারার রাজতন্ত্রের নিরিখে জাপানের পর সম্ভবত ত্রিপুরাই প্রাচীনতম। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর “বৃহৎ বঙ্গ” গ্রন্থে লিখেছেন— “ভারতবর্ষে বর্তমানকালে যত রাজ্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম আর কোন বংশে একাধারে পাইনা।”
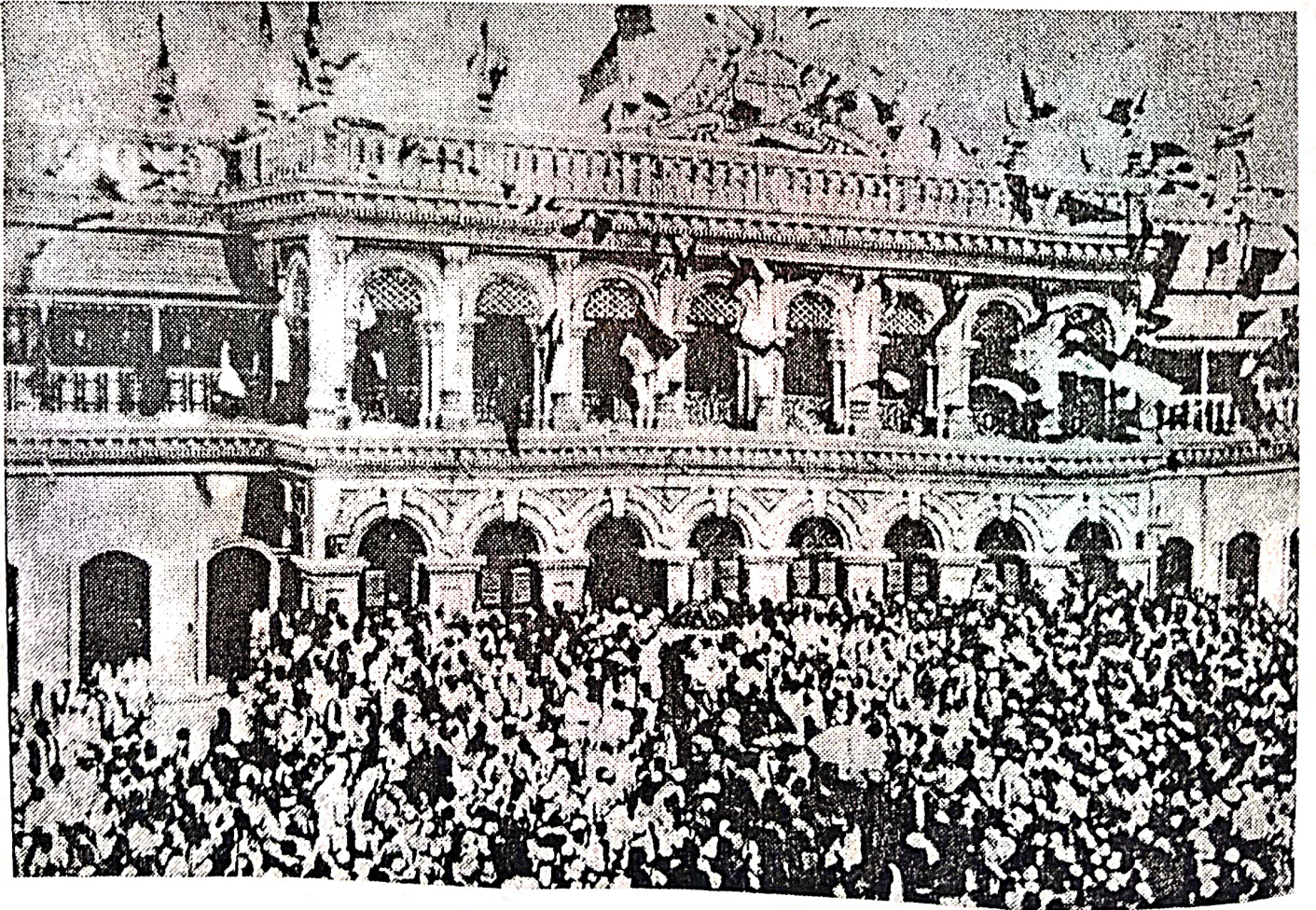
পুরাতন রাজবাড়ী, আগরতলা

শ্রী অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি তাঁর "শ্রী হট্টের ইতিবৃত্তি" গ্রন্থে লিখেছেন— "দ্রুহ্য বংশের ত্রিপুর নামে এক নৃপতি কিরাতভূমে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্শ্ববর্তী রাজাদের অপেক্ষা তিনি ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রাজধানী পূর্ব্বকালে কামরুপের সন্নিকটে কোপিল নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সেই প্রাচীন রাজধানীর নাম ত্রিবেগ। পরে কালের ক্ষয়ে এই ত্রিবেগ নগরী বিলুপ্তি প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং কালক্রমে বর্তমান কাছাড় ও শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজধানী স্থাপিত হয়।" সেই মহাভারতের কাল থেকে মহারাজ বীরবিক্রম অব্দি যদি ত্রিপুরার ইতিহাসের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রুপরেখাকে যদি সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করা যায় তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে পাঁচ সহস্র বছরের অধিক প্রাচীন এক উজ্জ্বল বহমান সনাতন

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ (১৯০৮) আগরতলা

ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন রুপে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে অনন্তের পথে। একদা যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার রাজাদের অনুসৃত বৈদিক চতুরাশ্রমের মহান ধারা পারম্পরিক ভাবে চিরঞ্জীবি হয়েছিল রাজ্যের অতি সাধারন প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও যা ছিল

অতি গর্বের বিষয়। ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমনের চরম দূর্দিনেও সুপ্রাচীনকাল থেকে পূজিত সনাতনী সংস্কৃতি তাই রক্ষা পেয়েছিল ত্রিপুরার বুকে। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের এক ব্যাতিক্রমী উত্তরাধিকারী। প্রতি রাজার রাজত্বকাল গড়ে ত্রিশ বছর হিসেবে গননা করলে দ্রুহ্যু থেকে মহারাজ বীরবিক্রম অব্দি দাঁড়ায় (১৮৪×৩০=৫,৫২০ বছর)। রবীরন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে জাতির পৌরাণিক কাহিনী নেই সেই জাতি অতি দীন। সৌভাগ্যবশতঃ ত্রিপুরা রাজ্য পৌরাণিক কাহিনীর অমৃত ভান্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। এখানে কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলতে হচ্ছে শুধুমাত্র এই কারণে যে বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদ আছেন যাঁরা সর্বদাই ভারতীয় পৌরানিক ইতিহাসকে গালগল্পের অধিক বলে কিছু মনে করেন না এবং প্রতিনিয়তই এর অবমূল্যায়ন করে আসছেন যা ভারতীয় সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ মানবিক মূল্যবোধের উত্তম আদর্শগুলি কিন্তু এইসব পৌরানিক কাহিনীগুলির মধ্যেই নিহিত আছে যা আমরা পুরুষানুক্রমে উপহার হিসেবে লাভ করেছি পূর্বপুরুষদের থেকে। সুতরাং পৌরাণিক কাহিনী যে ইতিহাস নয় তা আর কোনও যুক্তিতেই মানা যায় না বরং পৌরানিক কাহিনীগুলির বিশ্লেষনে ইতিহাসের অনালোকিত দিক্‌গুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সেদিক থেকে ত্রিপুরার ঐশ্বর্যশালী পৌরাণিক ব্যাখ্যান অনন্তকাল ধরে যেমন রাজ্যটিকে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি যুগিয়ে এসেছে তেমনি অসীম ক্ষাত্রবীর্য্যের দ্যূতি ধর্ম রক্ষায় রাজ্যটিকে অনুপ্রাণিত করেছে যুগান্তর ধরে। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন ঋকবেদীয় রাজা ভারত সম্রাট যযাতির দ্বিতীয় পুত্র দ্রুহ্যের বংশধর। যযাতি ছিলেন চন্দ্রবংশের ষষ্ঠতম রাজা। মহাভারতে কথিত আছে যে — যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির পাণিগ্রহন করেছিলেন এবং মহারানীর দাসীরুপে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। দেবযানির গর্ভে দুই পুত্র যদু, তুর্বসুর জন্ম হয় এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র যথাক্রমে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। অবৈধভাবে শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুত্রের জন্ম হওয়ায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতি

কে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দেন। তখন যযাতি সকল পুত্রকে ডেকে জরাব্যাধি গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে একমাত্র পুরু ছাড়া সকলেই অসম্মত হন। তাই যযাতি কনিষ্ঠতম পুত্র পুরুকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন এবং অন্য সকল পুত্রকে রাজ্যত্যাগের আদেশ দেন। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু পিতৃরাজ্য প্রতিষ্ঠানপুর ত্যাগ করে পূর্বাভিমুখে রওনা হয়ে সাগর সঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন যা বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে দ্রুহ্যুর বিভিন্ন দিকে যাত্রার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় যেমন মৎস্যপুরানে উত্তর দিকে, বিষ্ণুপুরানে পশ্চিম দিকে এবং ভাগবতে দক্ষিণ পূর্বদিকে। কিন্তু পন্ডিতগন শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় যুক্তির কারনে এবং দ্রুহ্যুর দক্ষিণ পূর্ব দিকে যাত্রা কেই সমর্থন করেছেন। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রী কালিপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষন রচিত "শ্রী রাজমালা" প্রথম লহরে পরিস্কার দেওয়া আছে। পিতা যযাতির শাপে নির্বাসিত দ্রুহ্যুকে সেদিন তত্ত্বদর্শী আশ্রয় প্রদান করেন এবং দ্রুহ্যুকে তাঁর আশ্রমে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বলে আর্শীবাদ করেন— "স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্" (রাজরত্নাকরম)। ভারতবর্ষে এখন অব্দি দ্রুহ্যুকে নিয়ে আর কোনও অঞ্চল এই দাবী করেনি যে সেই অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাতারা দ্রুহ্যু বংশীয়। যেহেতু দ্রুহ্যুর সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমে রাজ্য স্থাপন করাকে অগ্রাহ্য করার আর কোনও বীপরীত শক্তিশালী দাবী নেই সুতরাং এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে ত্রিপুর রাজবংশ দ্রুহ্যু বংশ জাত এবং এই পৌরাণিক যোগ আবারও প্রমান করছে সনাতনী ভারতে ত্রিপুরার অবিচ্ছেদ্য যোগসুত্র ও অবদান। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত যযাতির অভিশাপে দ্রুহ্যু নিজ রাজ্য থেকে যেভাবে নির্বাসিত হন, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে দ্রুহ্যু কে সেই স্থানে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেখানে পৌঁছুতে তাকে ভেলা ছাড়া অন্য কোন যানবাহনাদির উপকরণ মিলবে না।

রাজরত্নাকরম—ত্রিপুরা রাজবংশের সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ। সেখানেও দ্রুহ্যুর প্রতিষ্ঠানপুর থেকে সাগর দ্বীপের কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত যে যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায় তা অভূতপূর্ব। ভারতীয় পৌরাণিক শাস্ত্র নিয়ে যদি কেউ অনুসন্ধান

করতে চায় তবে রাজরত্নাকরম লুপ্ত সংযোগ খুঁজে বের করতে অকল্পনীয় সাহায্য করবে। যযাতির শাপ আর দ্রুহ্যুর যাত্রা, মহাভারতের এই ঘটনার সমান্তরাল সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে রাজরত্নাকরম। রাজরত্নাকরমে লেখা আছে যে যযাতি দ্রুহ্যু কে অভিশাপ দিয়ে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করার সময় বলেছিলেন— "যথায় নিত্য নৌরুপল্লবের সঞ্চার আছে সে স্থলেই তুমি সবংশে সেই অরাজ্য ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হইবে।" অর্থাৎ যে স্থানে ত্রিবেগের অবস্থান সেই গঙ্গার মোহনা অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন এলাকা (বর্তমান সুন্দরবন এলাকা) নদীপ্রধান অঞ্চল হবার কারনে সেখানে যাতায়াতের একমাত্র উপায় হল নৌকা। অর্থাৎ ভাগবতে দ্রুহ্যুর গমনের যে দিক্ নির্দেশ দেওয়া আছে তা রাজরত্নকরম পাঠে নির্ভুল প্রমাণিত হয়। তত্ত্বদর্শী কপিলমুনি সেদিন দ্রুহ্যু কে আর্শীবাদ করেন এবং এইভাবেই প্রথম ত্রিবেগ নগরীর গোড়াপত্তন হয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পরবর্তীকালে দ্রুহ্যুর অধস্তন ছাব্বিশতম রাজা শত্রুজিৎ পর্যন্ত ত্রিবেগে রাজত্ব করেন। এরপর শত্রুজিতের পুত্র মহাবলী প্রতর্দ্দন কিরাত প্রদেশ জয় করে কপিল নদীর তীরে দ্বিতীয় ত্রিবেগ রাজ্য স্থাপিত করেন। এই বিষয়ে আর এম নাথ তাঁর "The Background of Assamese Culture" গ্রন্থে এক মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে— "The Tipperahs have a tradition that Drahyu one of the sons of Yayati the renowned King of the Lunar Dynasty of Delhi married a Bodo princess against his father's will and was disinherited.........It is traditionally believed that one Protardon came over to Assam and eshtablished a Kingdom named Trivega in about 1900 B.C with his head quarters on the bank of the Kapili river in the present Nowgong district and the dynasty ruled for full fourteen generation"। এই দ্বিতীয় ত্রিবেগের ঐতিহাসিক অবস্থান বলতে বোঝায় কপিল নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের মিলনস্থল। ভারততত্ত্ববিদ পার্জিটার সাহেবের মতে এই কপিল নদীর আরেক নাম হল 'কৃপা'। মার্কন্ডেয় পুরানেও এই কৃপা নদীর উল্লেখ আছে। পন্ডিত শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে পুরানের 'কপিলা' বা 'কপিলা গঙ্গাই' হল এই কপিল নদী। বর্তমান

কালেও এটি কপিলি নদী হিসেবে প্রবহমান। কলিকাপুরানের একাশিতম অধ্যায় পাঠে জানা যায় কপিল নদীর উৎপত্তি কামাখ্যার নীল পর্বতের অন্তর্গত 'ব্রহ্মবিল' হতে। পরবর্তীকালে পারিবারিক অন্তর্দ্বন্ধের ফলে দ্রুহ্যুবংশীয়রা কপিল নদীর তীরবর্তী ত্রিবেগ থেকে সরে এসে কাছাড় ও শ্রী হট্টের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। দ্বিতীয় ত্রিবেগ নগরীতে মহারাজ ত্রিলোচন পর্যন্ত শাষনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিলোচন ছিলেন দ্রুহ্যুর পরবর্তী বিয়াল্লিশতম রাজা এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের
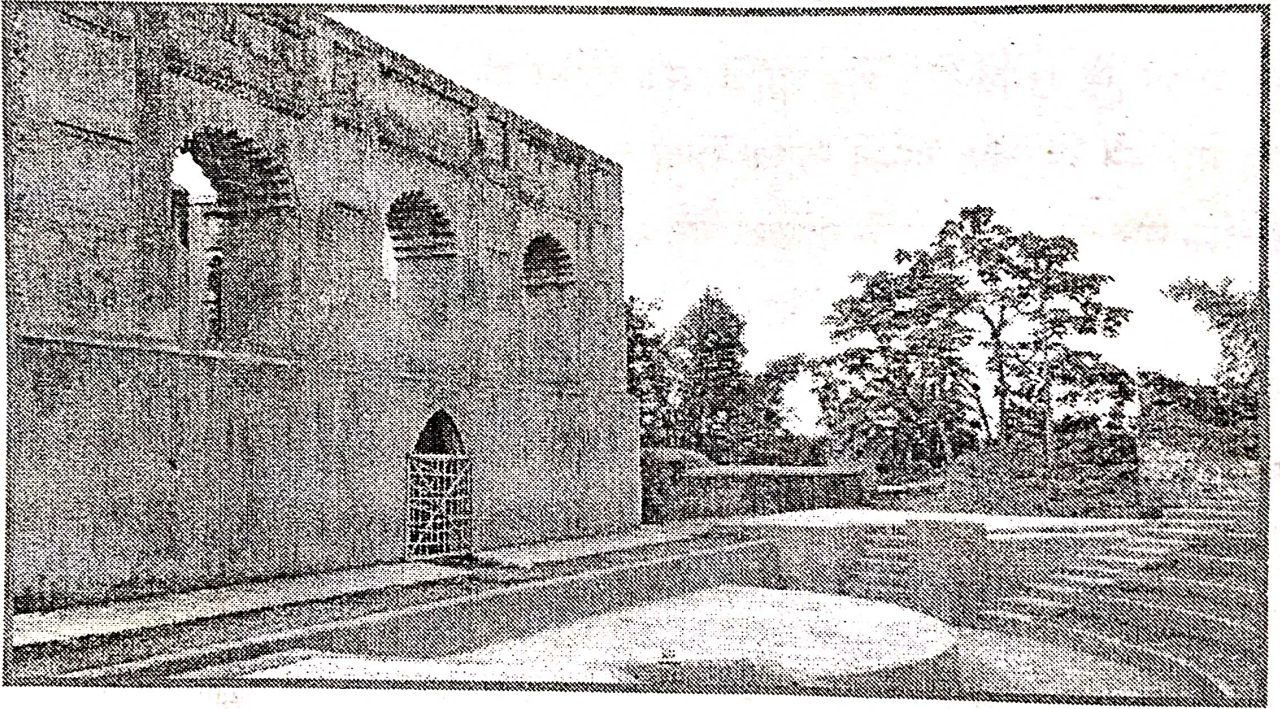
উদয়পুরের প্রাচীন প্রাসাদ

সমসাময়িক ত্রিলোচনের পিতা ছিলেন প্রজাপীড়ক অধার্মিক ত্রিপুর প্রজাবৃন্দের কাতর আরাধনায় সেদিন সাড়া দিয়ে ধরাধামে অবতীর্ন হতে হয়েছিল মহাদেব শিবকে ত্রিপুরকে হত্যা করতে। ত্রিপুরকে হত্যা করবার পর ভগবান শিব প্রজা সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তাঁর আর্শীবাদে এক দেবতুল্য রাজাপুত্রের জন্ম গ্রহণ হবে যিনি সমগ্র প্রজাসকলের কল্যাণ করবেন। দৈবিক আদেশে সেদিন ত্রিপুরের বিধবা পত্নী মহারানী হীরাবতীর কোল আলো করে জন্মেছিলেন শিব তুল্য ধার্মিক রাজা ত্রিলোচন। প্রজাসকল শিবের অংশস্বরুপ জ্ঞানে ত্রিলোচনকে পূজা করতে লাগলেন এবং তাকে লৌকিক নাম 'শিবরায়' বা 'সুব্রাই' দিয়ে প্রখ্যাত

করে তুললেন। ত্রিপুরায় চতুর্দশ দেবতা পূজার ইনিই ছিলেন প্রবর্তক। রাজমালায় ত্রিলোচনের গুনকীর্ত্তনে বলা হয়েছে যে মহারাজ কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, দেবতুল্য বিনয়ী, অহংকার ক্রোধ রিপুদোষবিহীন, বৃহস্পতির ন্যায় বাক্যন্যাস শক্তিধর, শুক্রের ন্যায় জ্ঞানী এবং সর্ব্বকলা সংগীত বিদ্যায় ছিলেন গন্ধর্ব। ত্রিপুরীদের সমস্ত সামাজিক ন্যায় নীতি ও শিল্পের দিশারী হিসেবে সুব্রাই রাজা আজও পূজিত। এইরকম দেবস্বরুপ রাজা যখন রাজত্ব করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রজারাও ভগবৎ অনুগামী হন। মহারাজ ত্রিলোচনের ছিল দ্বাদশ পুত্র। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর জ্যাষ্ঠ পুত্র দৃকপতি ও দ্বিতীয় পূত্র দাক্ষিনের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিবেগ রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন ও কাছাড় এবং শ্রী হট্টে এসে উপনিবেশ গড়েন। নতূন রাজধানীর নামকরন হয় খলংমা। রাজপন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা ১৩২৯ শকাব্দে রচিত প্রাচীন রাজমালায় উল্লেখ করেছেন যে— "কপিল নদীর তীর ছাড়ি দিয়া, একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রনা করিয়া, সৈন্যসেনা সাথে রাজা স্থানান্তরে গেলা। বরবক্র উজানের খলংমা রহিলা।" অর্থাৎ বরবক্র নদী বা বরাক নদীর তীরে খলংমা নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন দাক্ষিণ। পরবর্তীকালে আরও দক্ষিনে ছাম্বুল নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই ছাম্বুল নগর হল কৈলাসহর ঊনকোটী তীর্থের সন্নিকট প্রাচীন অঞ্চল। ছাম্বুলে ত্রিপুরার রাজারা রাজত্ব করেন মহাপরাক্রমশালী যুঝার ফা অব্দি। আনুমানিক ৫৯০ খৃঃ যুঝার ফা রাঙামাটি অর্থাৎ বর্তমান উদয়পুর জয় করেন এবং এই জয় কে চিরস্মরনীয় করে রাখবার জন্য ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। এই যুঝার ফা ছিলেন দ্রুহ্য থেকে একশত দ্বাদশতম রাজা। যুঝার ফার পরবর্তী তিন পুরুষ রাজার পরে ছাম্বুল নগরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন বিখ্যাত বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনকারী রাজা "আদি ধর্ম্ম পা"। এই আদি ধর্ম পা ই ৬৪০ খৃঃ শ্রীহট্টের পঞ্চখন্ডে মিথিলা থেকে বৈদিক ব্রাহ্মন ত্রিপুরা তথা প্রাচীন বঙ্গে আনয়ন করেন। এই ঘটনা আজও বিখ্যাত হয়ে আছে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মনদের দ্বারা রচিত "বৈদিক সংবাদিনী" গন্থে। কালক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে ত্রিপুরার রাজাদের পরিশ্রমে যার বিস্তৃতি একসময় ছিল পূর্বে মেখলি

রাজ্য বা বর্তমান মণিপুর রাজ্য পর্যন্ত, পশ্চিমে কোচবঙ্গ পর্যন্ত, উত্তরে তৈয়ঙ্গ নদী এবং দক্ষিনে আচরঙ্গ বা আরাকান রাজ্য পর্যন্ত। এয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কোনও মুসলিম শক্তির সঙ্গে প্রথমবার বিরোধ ঘটে ত্রিপুরার রাজার। কিন্তু সেই বিরোধ যখন যুদ্ধে পরিনত হয় তখন ত্রিপুরার রাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রবল বিক্রমের সামনে পরাজিত হতে হয় গৌড়ের সুলতানকে। ভারতবর্ষে নারীশক্তি লক্ষিমন্ত বলেই পূজিত হন চিরাচরিত ভাবে কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে তাঁর মধ্যে দূর্গার মত মহাশক্তির রুপও যে জাগরিত হতে পারে তা প্রমান করেছিলেন মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী। প্রবাল পরাক্রান্ত বিদেশী আক্রমনকারীদের ভয়ে যখন মহারাজ ছেংথুমফা বা সিংহতুঙ্গ ফা বিনা যুদ্ধে সন্ধি করতে উদ্যত তখন দেশ মাতৃকার চরম দুর্দিনে সমগ্র রাজ্যবাসীকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকা নিতে পিছপা হননি মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী। সেদিন বীরাঙ্গনা এই নারীর প্রবল বিক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল গৌড়ের সুলতানের সেনা। ভারতবর্ষে কোনও রাণীর এরুপ যুদ্ধে বিজয় লাভের কাহিনী অতি বিরল। এরপর রাঙ্গামাটি অর্থাৎ বর্তমান উদয়পুর কে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন প্রথম রত্নমানিক্য, তার গৌরবশালী ইতিহাস আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। মধ্যযুগের ধন্যমাণিক্য, দেবমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, কল্যাণমানিক্যের মত সার্বভৌম শক্তিশালী রাজাদের কাহিনী আজও যেমন মনে বিস্ময় জাগায় তাদের অবিস্মরনীয় সামরিক ও প্রশাসনিক উত্থানের জন্য তেমনি চারিত্রিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা হিসেবে আজও উজ্জ্বল রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য, যশোমাণিক্য ইত্যাদি রাজন। শুধুমাত্র যুদ্ধ জয়ই নয় সাহিত্য, সংগীত ও ধর্মক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল এই সব মহান রাজাদের সুশাষনে। ক্ষত্রিয়ের পরমধর্মই হল শরনাগত কে শরণ দেওয়া। ত্রিপুরার বীর রাজগন মধ্যযুগের নিপীড়িত সনাতন ধর্মের প্রজাবর্গের সত্যিকারের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিপুরার রাজচিহ্নে অংকিত বানী—"কিল্ বিদুর্বীরতাং সারমেকং" অর্থাৎ বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানব, এই মহান ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের দূর্বল অংশের মানুষদের রক্ষা

করা ও আশ্রয় প্রদান করা, মাণিক্য রাজবংশের রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। যে বীরত্বের সঙ্গে ত্রিপুরা বিদেশী আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, সেই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক জেমস্ লঙ্ বলেছিলেন— "এখানকার পার্বত্য প্রাচীর এবং অপূর্ব অরন্য তাঁর নেতাদের সুবিধে করে দিয়েছিল আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে একটা বিরোধীতার চেতনা জাগিয়ে রাখতে, অনেকটা প্রাচীন কালের ওয়েলস্‌দের মত অথবা কভেন্সের হিউগনট্‌দের মত এবং শতাব্দী ধরে রক্ষা করেছিল হিন্দু রীতিনীতিকে মুসলমান নিয়ন্ত্রিত প্রচারের হাত থেকে। এখানকার শাষকবর্গ নিজেদের চন্দ্র বংশীয় সম্ভুত বলে গর্ব করেন ও বীর রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দের থেকে উৎপত্তি বলে দাবী করেন। বিদেশী আক্রমণের ঢেউয়ে বাংলার সমস্ত প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র বিষ্ণুপুর ও ত্রিপুরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল। ..... শিখদের মতই ত্রিপুরার অধিবাসীগন ছিলেন এক যুদ্ধবাজ জাতি।"

ত্রিপুরার রাজাদের সম্পর্কে বলতে তাই দ্বিধা করেননি রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে— "ভারতীয় পুরান, কাব্য পাঠ করে প্রাচীনকালের রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চধারনা মনে জন্মায়, সেই সব গুনাবলী ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে দেখেছি।"

মহাভারত, পুরান, রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুসারে ত্রিপুরা রাজবংশের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাসের একটা আনুমানিক তালিকা প্রণয়ন করলে দেখা যায় ১৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্ব থেকে ১৩০০ খৃঃ পূর্ব্ব পর্যন্ত্য ত্রিপুরার রাজবংশ প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রিবেগে রাজত্ব করেন, খলংমাতে ১৩০০ খৃঃ পূর্ব্ব থেকে ১৫০ খৃঃ পূর্ব্ব পর্যন্ত প্রায় ৫২ পুরুষ রাজা বিথার পর্যন্ত, ১৫০ খৃঃ পূর্ব্ব থেকে ৫৯০ খৃঃ পর্যন্ত ছাম্বুলে এবং ৫৯০ খৃঃ হতে বর্তমান ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন।

ত্রিপুরার ভূপতি বৃন্দ ধর্ম আচরন বিষয়ে বিশেভাবে উদার ছিলেন। কোন

নির্দ্দিষ্ট একটি পন্থায় তাঁরা জীবন নির্বাহ করতেন না। ত্রিপুর রাজবংশীয়গণের লক্ষন বর্ণনা কালে রাজমালা বলছে যে—

"হরি হর দুর্গা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার।
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয় তাহার।।" (ত্রিলোচন খন্ড)

উপরিউক্ত ভাষ্য থেকে এটা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। একবার কলকাতায় দ্বারভাঙ্গার রাজা ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কোন ধর্ম পন্থার মতাবলম্বী ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাধাকিশোর মাণিক্য এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন— "ত্রিপুরার রাজা হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, কথা কিছু বিস্তৃত হইবে। আমরা পুরুষানুক্রমে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবা করিয়া আসিতেছি, বিধিমত ছাগাদি বলিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা হয়। আমার কুলদেবতার মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাই আছেন, সেই সকল দেবতার অর্চ্চনাতেও ছাগাদি বলি দেওয়া হইতেছে। এমনকি আমার সিংহাসনের পুজায়ও পাঁঠা বলির ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব পুরুষগনের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তিমূর্তি এবং বিষ্ণু বিগ্রহ অনেক আছে। শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা ত্রিপুরা রাজধর্ম মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং রাজা হিসাবে আমিও সেই সমস্ত দেবতার সেবক। কিন্তু ব্যাক্তিগতভাবে আমি বৈষ্ণব। এই উত্তর শুনে দ্বারভাঙ্গার রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন— "ইহা সার্ব্বভৌম সম্রাটের যোগ্য কথা! আপনার উত্তর শুনিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম।"

“ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজাদের স্মরণীয় কীর্তি”

আদিকাল থেকে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর পর্যন্ত।

প্রচেতা— দ্রুহ্যের অধস্তন অষ্টম রাজা। ইনি তাঁহার সংগৃহীত রাজকরের অর্ধেক অংশ প্রকৃতিপুঞ্জের সেবায় ব্যায় করতেন। এবং অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ স্বজন বর্গের ভরণ পোষনে ব্যায় করতেন। ব্যয়াবশিষ্ট টাকা রাজকোষে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ছিল।

পুরুরবা— দ্রুহ্যের অধস্তন এয়োদশতম রাজা। রাজা সবসময় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগনের উপদেশ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজা প্রজার মধ্যে এক সুদুর্ল্লভ পবিত্র প্রীতিভাব স্থাপিত হয়েছিল।

পুরুসেন— দ্রুহ্যের অধস্তন পঞ্চদশতম রাজা। সর্বগুনে গুনান্বিত রাজা। অযোধ্যাপতি রাজচক্রবর্ত্তী দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করেছিলেন।

প্রতর্দ্দন— মহাঋষি বিশ্বামিত্র থেকে সর্বকলাবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে এক শক্তিশালী রাজা হয়ে উঠেছিলেন। ইনি কিরাত দেশ জয় করে কপিল নদীর তীরে দ্বিতীয় ত্রিবেগ রাজ্য স্থাপন করেন।

কলিন্দ— মহারাজ কলিন্দ দানশীল, ধর্মপরায়ণ ও দয়াবান শাষক ছিলেন। প্রজার কল্যাণ করাই তাঁর জীবনের সারব্রত ছিল। ইনি প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্য সুন্দরবনে ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দৈত্য— ইনি মহারাজ চিত্ররথ ও মহারানী সুশীলা দেবীর কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন। বাল্যকালে গৌতম ঋষির আশ্রমে জীবন ব্যতিত করবার সময়ই মহাবলী অশ্বত্থামার দর্শন পান। তিনি অশ্বত্থামার নিকট ধনুর্বিদ্যা শেখেন ও শত্রুদের পরাস্ত করে পিতৃরাজ্য পুনঃরুদ্ধার করেন। মহারাজ দৈত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আসাম ও মল্লদেশ জয় করেন ও নিজ রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। তিনি চেদীশ্বর দুহিতা মান্ডবীর পানিগ্রহন করেন। মান্ডবীর গর্ভে ত্রিপুর নামক এক পুত্র জন্মগ্রহন করেন। এই ত্রিপুরই দৈত্যের বানপ্রস্থে যাবার পর ত্রিপুরার রাজা হন। ত্রিপুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী শিবের আরাধনা করতে থাকেন। মহাদেবের ত্রিশুলের আঘাতেই পরবর্তীকালে ত্রিপুরের নিধন হয়।
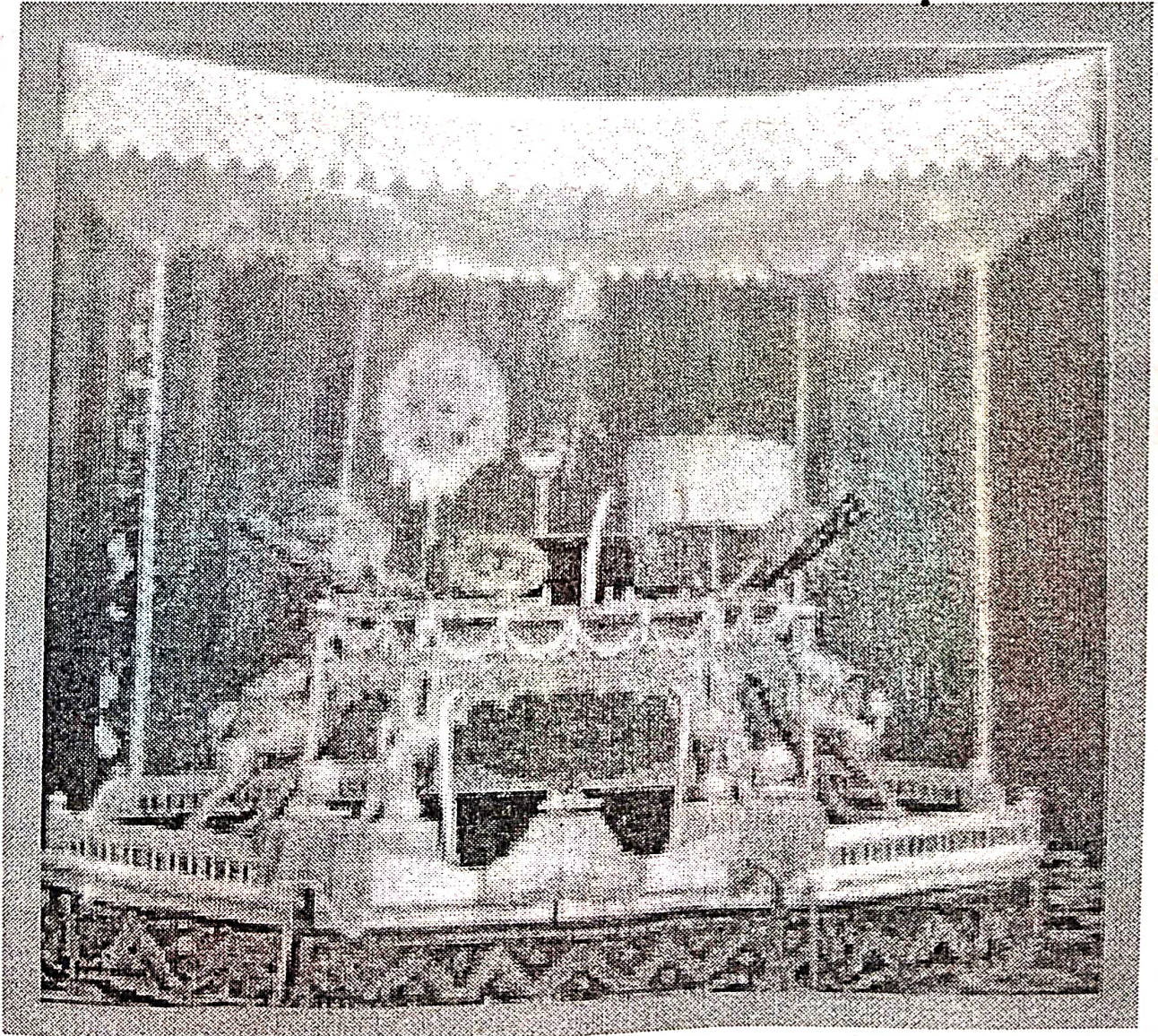
ত্রিপুরার রাজসিংহাসন

ত্রিলোচন— শিবের বরপুত্র এবং মহারাজ ত্রিপুরের সন্তান, প্রাগৈতিহাসিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ত্রিলোচন। অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্ম ত্রিলোচনের স্বরূপ শিশু অবস্থা থেকেই ছিল দেবতুল্য। ত্রিলোচন ছিলেন সুচরিত্রের অধিকারী, দেবরূপ বিনয়ী, কন্দর্পের ন্যায় রুপবান, সংগীত কলা বিশারদ এবং অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। ত্রিলোচন মহারাজ সাধারণ ত্রিপুরাবাসীর কাছে সুবড়াই নামে খ্যাত হলেও বেদমার্গী সাধুজনের কাছে ত্রিলোচন নামেই সুপরিচিতি পেয়েছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচনকে ত্রিপুরী সমাজে সমস্ত রকম নিয়ম নীতি, আচার ব্যবহার, চরিত্র গঠন, শিল্পকলা বিদ্যার পিতারুপে গন্য করা হয়েছে। ত্রিলোচন মহারাজ শিবের আজ্ঞায় ত্রিপুরায় চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার প্রচলন করেছিলেন যা এখনও একইরকমভাবে চলছে। ত্রিলোচন ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠির যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে ত্রিলোচন কে আপ্যায়িত করেছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচনই ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামমুদ্রা বা কের পূজার প্রবর্তন করেন তথা রাজ্যের প্রধান উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসব, দোলোৎসব, জলোৎসব চৈত্রে, মাঘমাসে সূর্য পূজা, শ্রাবণ মাসেতে পদ্মাবতীর পূজা ও মকর সংক্রান্তিতে পূর্বপুরুষের পিন্ডদান শ্রাদ্ধাদির বিধান দিয়ে যান।

দাক্ষিণ— ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ জৈষ্ঠভ্রাতা দৃক্পতির সাথে বিরোধের ফলে দ্বিতীয় ত্রিবেগ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন ও বরবক্র বা বরাক নদীর তীরে খলংমায় রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠিত করেন।

নীলধ্বজ বা ঈশ্বর ফা— এনার সময় থেকেই ত্রিপুরার রাজারা হালাম ভাষার একটি নাম গ্রহন করতে শুরু করেন এবং 'ফা' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি চুরাশি বছর রাজ্য পালন করেছিলেন।

যুঝার ফা বা হামতার ফা— ইনিই ৫৯০ খৃঃ রাঙামাটি বর্তমান উদয়পুর জয় করেছিলেন। এই জয়কে চিরস্মরনীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন।

আদিধর্ম পা বা কিরীট— ৫১ ত্রিপুরাব্দে, ৬৪১ খৃঃ অনাবৃষ্টির নিবারনকল্পে এক বিরাট বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন বর্তমান শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর তীরে। এই ঘটনাকে চির অক্ষয় করে রেখেছেন সেই যজ্ঞে মিথিলা থেকে আগত পঞ্চগোত্রের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মনেরা তাদের "বৈদিক সংবাদীনি" পুস্তকে। বলা যায় ত্রিপুর নরপতির হাত ধরেই এই অঞ্চলে প্রথম বৈদিক ব্রাহ্মনের উপনিবেশ গড়ে উঠে যা পরবর্তীকালে বাংলার সামাজিক ব্যবস্থায় বিরাট অবদান রাখে।

মহারাণী তুলসীবতি দেবী

ধর্মধর ফা— মহারাজ ধর্মধরও আদিধর্ম পার মত প্রজার ও দেশের মঙ্গলার্থে ৬০৪ ত্রিপুরাব্দে নিধিপতি নামক এক ব্রাহ্মনের নেতৃত্বে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদনের পর নিধিপতি কে রাজা প্রচুর জমি দান করেন যা

পরবর্তী সময়ে শ্রী হট্টের 'ইটা' রাজ্যের স্বীকৃতী পায়। এই ঘটনা প্রমান করে ত্রিপুরার রাজাদের সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সে সময় ইটার মত বহু ছোট রাজ্যেরও গঠন কীভাবে সম্ভব হয়েছিল ত্রিপুরার রাজাদের বদান্যতায়।

ছেংথুম ফা এবং মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী— ছেংথুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফাই প্রথম ত্রিপুরার রাজা যিনি বঙ্গের মুসলমান শাষকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। হিরাবন্ত চৌধুরী নামে এক সেনাপতি কে যখন ছেংথুম ফা শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন তখন সে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল গৌড়ের সুলতানের কাছে। গৌড়ের সুলতান তখন ত্রিপুরাকে উচিৎ শিক্ষা দিতে যুদ্ধের ঘোষনা করলেন। কিন্তু ছেংথুম ফা কিছুটা ভয়াবশত সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করতে যখন মনস্থির করলেন তখন তাঁর মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী এইরুপ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। স্বামীকে ভৎর্সনা করে নিজেই মহারাণী সমগ্র রাজ্যবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন যুদ্ধের জন্য। ১২৪০ সালে অসাধারন এই ঘটনাটি ঘটে। সেই যুদ্ধে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী সেনাপতির স্থান গ্রহন করেছিলেন এবং সমগ্র সৈন্যকে পরিচালনা করেন। সেই বিষম যুদ্ধে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রবল বিক্রমের সামনে গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সৈন্য চরমভাবে বিধবস্ত হয়।

রত্ন মাণিক্য (১৪৬৪-১৪৬৭ খৃঃ) রাজমালার মতে রত্ন ফাই প্রথম রাজা যিনি গৌড়ের সুলতান থেকে মাণিক্য উপাধি পান যা পরবর্তী রাজগন ব্যবহার করে এসেছেন এবং এই ভাবেই মাণিক্য বংশের ধারা চলে এসেছে এয়োদশ শতাব্দী থেকে নির্বচ্ছিন্ন ভাবে। রত্ন মাণিক্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন যিনি ত্রিপুরায় একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রশাসনিক গোড়াপত্তন করেছিলেন প্রাক্ মধ্যযুগে। ত্রিপুরায় নবশাখ জাতির লোকজনদের বসতি স্থাপন করান রাজা রত্ন মানিক্য। নবশাক রা হল—নাপিত, পান উৎপাদনকারী, গোয়ালা, মিস্টান্ন প্রস্তুতকারক, মালি, তেলী, কামার, মৃৎশিল্পী, এবং তাঁতী শ্রেণীর লোকজন। মাণিক্য বংশীয় প্রথম নৃপতি রত্ন মাণিক্যের দ্বারা প্রচলিত প্রথম মুদ্রাটি পাওয়া গেছে ১৩৮৬ শকাব্দের (১৪৬৪ খৃঃ)।

মহামাণিক্য (১৪০০-১৪৩০ খৃঃ)— ইনি চোদ্দশ খৃঃ শুরুর দিকে অহমিয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের জন্য লেখক মাধব কন্দলীকে পৃষ্ঠাপোষকতা দান করেন।

ধর্ম মাণিক্য প্রথম (১৪৩১-১৪৬২ খৃঃ)

মহারাজ মহামাণিক্যের পুত্র ধর্ম মাণিক্য বাল্যকাল থেকেই ছিলেন সংসার বিরাগী। যৌবনের লগ্নে তিনি সন্ন্যাস গ্রহন করে তীর্থে বেরিয়ে যান। তীর্থ ভ্রমনের সময় একবার বারানসীধামে এসে গঙ্গার ঘাটে যখন গাছের ছায়ায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন একটি সাপ তার ফনা তুলে ছায়া দিচ্ছিলেন ধর্ম মাণিক্যকে। সেই পথে তখন কৌতুক শর্মা নামে এক ব্রাহ্মন যাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যাঁর মাথায় সাপ তার ফনা ধরে ছায়া দেয় সেই ব্যক্তি কোনও সাধারণ ব্যক্তি হতে পারে না, নিশ্চয় কোনও মহান ব্যক্তিই হবে। তিনি তখন মহারাজ ধর্মকে জানালেন ও জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মত ব্যক্তি তো সচরাচর দেখা যায় না, তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং বারানসীতে কী করছেন। মহারাজ ধর্ম বললেন তাঁর দেশ অগ্নিকোনে এবং জাতিতে তিনি ত্রিপুর। তিনি রাজপুত্র এবং তীর্থ ভ্রমনে বেড়িয়েছেন। কৌতুক ব্রাহ্মন বুঝতে পারলেন এবং রাজকুমার ধর্মকে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন। রাজকুমার ধর্ম কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মন কৌতুককে তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরায় যাবার অনুরোধ করলেন। কৌতুক ব্রাহ্মন তার সঙ্গে আটজন আরও ব্রাহ্মন সঙ্গে নিলেন এবং যুবরাজ ধর্মের সঙ্গে ত্রিপুরায় আগমন করলেন। যুবরাজ ধর্ম ত্রিপুরায় এসে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন ও ধর্মের সঙ্গে রাজ্য প্রজা পালন করতে লাগলেন। ধর্ম মাণিক্যের উল্লেখনীয় কাজগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় সামরিক শক্তির সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ন অঞ্চলগুলিতে দূর্গ তৈরী করা, কসবা, কুমিল্লা ও উদয়পুরে সুবৃহৎ দীঘি খনন করা, জন মানবের কল্যান হেতু, রাজ্যের সীমানা পরিবর্ধিত করা ও সনাতন হিন্দু জনগনকে সুরক্ষা প্রদান করা। ধর্ম মাণিক্যের শাসনে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত উন্নতি ঘটেছিল। মহারাজ ধর্ম মাণিক্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন 'শ্রী রাজরত্নাকরম' ও 'রাজমালা'

গ্রন্থের মাধ্যমে। তিনিই পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বরকে দিয়ে রাজচন্তাই দুর্লভেন্দ্রর সাহায্যে সংস্কৃতে রাজরত্নাকরম ও বাংলা ভাষায় রাজমালা রচনা করান। তিনি বহু গুনী ব্যক্তি ও ব্রাহ্মনকে ভুমি দান করেছিলেন।

ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২০ খৃঃ)

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের জীবন শুধুমাত্র ভারতীয় ইতিহাস নয় পৃথিবীর অন্যতম বীরগাঁথা হিসেবে নিঃসন্দেহে এক বরনীয় কাহিনী। পিতা ধর্ম মাণিক্যের মৃত্যুর পর সেনাপতিদের চক্রান্তে জ্যাষ্ঠ পুত্র হবার পরও বহুদিন তাকে সিংহাসন থেকে দূরে থাকতে হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ মানিক্যের চেয়ে গুনবান হওয়া সত্যেও সেনাপতিরা তাকে সিংহাসনে বসতে দেননি। পঞ্চদশ শতকে নিজ বলে ও বুদ্ধিতে পূর্বভারতে সর্ববৃহৎ এক সাম্রাজ্য গড়তে পেরেছিলেন। ধন্যমাণিক্যের সময় ত্রিপুরার সীমা উত্তরে শ্রী হট্ট রাজ্য পূর্বে মণিপুর দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে মেঘনা নদীর পূর্বকুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলে। ধন্যমাণিক্যের দুজন বীর সেনাপতি ছিলেন রায় কাচাগ্ এবং রায় কসম যাদের বীরত্বের কাহিনী এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে লোকমুখে প্রচারিত। তৎকালীন বাংলার সুলতান হুসেন শাহকে ধন্যমাণিক্যের শৌর্য্যের কাছে বারবার পরাজিত হতে হয়েছে। ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতলার প্রানচঞ্চল কামান চৌমুহনীতে রাখা যুদ্ধে বিজিত হোসেন শাহের কামান অসংখ্য সমর বিজয়ী ধন্যমাণিক্যের বীরত্বের কাহিনী ঘোষনা করছে। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ধন্যমাণিক্য ও তাঁর রানী কমলাদেবী রাঙামাটি, বরদাখাত, আরাকান এবং কৈলাগড়ে জলাশয়ের সৃষ্টি করেন। ধন্যমাণিক্য নিজে শিবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রচুর মঠ ও মন্দির নির্মান করেছিলেন। ১৫০১ খৃঃ পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মঠ ও মন্দিরের নির্মান করান। এছাড়াও চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরও তৈরী করান ধন্যমণিক্য। ধন্যমাণিক্য মহান অশোক সম্রাটের মত অহিংসার পথেও চালিত হয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শতাব্দী প্রাচীন বলিপ্রথাতে কিছু শিথিলতার প্রয়োগ করেন। বহু যুগ ধরেই ত্রিপুরার সাধারন প্রজারা অনেক কষ্ট করে উত্তর ভারতের তীর্থ

স্থানে শ্রাদ্ধ পিন্ডদান করতে যেতে হতো। ধন্যমাণিক্য প্রজাদের এই তীর্থ যাত্রার দুঃখ বুঝতে পারলেন এবং তৎকালীন যুগের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মন পন্ডিতদের বোঝাতে সক্ষম হন যে ত্রিপুরার ডম্বুর ছড়াকে পিন্ড দানের জন্য কেন নির্বাচন করা হবে
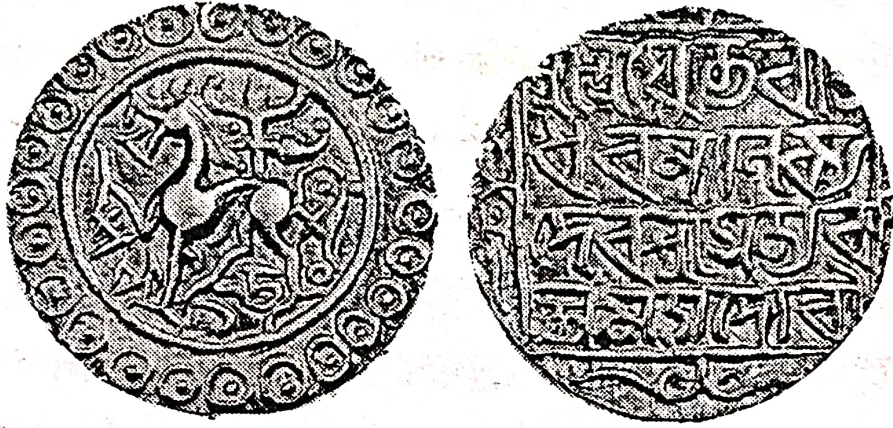
মহারাজা ধন্য মাণিক্যের মুদ্রা

না। সে মতে ধন্যমাণিক্যের আমল থেকেই ডম্বুর তীর্থ পিন্ডদানের জন্য রাজ্যের প্রজাসাধারনের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠে। ধন্যমাণিক্য নিজে সংগীত নৃত্য কলার একজন গুনগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ত্রিহুত ও মিথিলা থেকে সংগীত নৃত্য কলাবিদের ত্রিপুরাতে নিয়ে আসেন রাজ্যের শিল্পীদের উন্নতিকল্পে। সাহিত্যের আঙিনাও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল ধন্যমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রেত চতুর্দ্দশীর গান, উৎকলখন্ড পাঁচালী, যাত্রা রত্নাকর নিধি রচিত হয়েছিল ধন্যমানিক্যের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। নিঃসন্দেহে ধন্যমাণিক্য মধ্যযুগের এক মহান নেতা ছিলেন।

বিজয় মাণিক্য প্রথম (১৫২৮-১৫৬৩ খৃঃ)— তিনি ছিলেন পন্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, বীরযোদ্ধা একা রাজা। শক্তিশালী রাজা হিসেবে তাঁর উত্থানের কাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়ের ও সমীহের।

মহারাজ দেবমানিক্যের জ্যাষ্ঠ পুত্র ছিলেন বিজয় মাণিক্য। উনি ১৫১২ খৃঃ জন্মগ্রহন করেছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্যের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সবচাইতে বেশী পরিবর্ধিত হয়েছিল। বিজয় মাণিক্য মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আকবর বাদশার সভা পণ্ডিত ও মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বিজয় মাণিক্যের সামরিক শক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর দুলক্ষ পদাতিক বাহিনী, এক হাজার হাতি, পাঁচ হাজার নৌকা, এক হাজার অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও ধনুর্ধররা ছিল। বিজয়মাণিক্যের শাসনে ত্রিপুরার সীমা উত্তরে খাশী জয়ন্তিয়া রাজ্য পর্যন্ত পৌছেছিল, দক্ষিণে আরাকান পর্যন্ত, পশ্চিমে গঙ্গানদীর পূর্বপ্রান্ত অব্দি যশোহর খুলনা পর্যন্ত এবং পূর্বে মণিপুর রাজ্য পর্যন্ত। বিজয় মাণিক্যের শাসনে ত্রিপুরা ধনধান্যে ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করবার পর বিজয় মাণিক্য প্রথমে পরশুরাম তীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করেছিলেন। তারপর একে একে পদ্মা নদী ও

মহারাজা বিজয় মাণিক্যের মুদ্রা

লাক্ষ্যা নদীতে স্নান করেন এবং পুন্য অর্জন করেছিলেন। তারপর উনকোটী তীর্থ দর্শন করে সসৈন্য পরিবৃত হয়ে বিজয় মাণিক্য রাজধানী রাঙামাটিতে আগমন করেছিলেন। রাজধানীতে তিনি কল্পতরু ও তুলাপুরুষ দান ইত্যাদি পুন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন বঙ্গ বিজয়ের পর। তিনি ধ্বজনগর নামক স্থানে বিভিন্ন স্বর্ণকার ও কাসারীদের স্থাপন করেন। বিজয় মাণিক্য রাঙামাটিতে হীরা গোপীনাথের এক মন্দির তৈরী করান জনগনের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে। বিজয়সাগর নামে রাঙামাটিতে এক দীঘিরও খনন করিয়েছিলেন বিজয় মাণিক্য।

অমরমাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ খৃঃ)

অমরমাণিক্য ছিলেন মহারাজ ধন্যমণিক্যের পৌত্র, দেবমাণিক্যের পুত্র

ও বিজয় মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই। চৌদ্দশ ঊনশত শকে অর্থৎ ১৫৭৭ খৃঃ অমরদেব অমরমাণিক্য নামে সিংহাসনারুঢ় হন। মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী রাজা ছিলেন অমরদেব। তিনি রাজমালা দ্বিতীয় লহর রচনার সূচনা করেছিলেন ১৫৭৮ খৃঃ। সিংহাসনে বসেই অমরমাণিক্য ঘোষণা করেন উদয়পুরে এক সুবিশাল হ্রদের খনন কার্য্যের। প্রকারান্তরে এই দীঘি খনন রাজসূয় যজ্ঞের চেহারা নিয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সামন্ত রাজা জমিদাররা দীঘি খনন করার জন্য উদয়পুরে লোক পাঠিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৭১০০ জন শ্রমিক এই দীঘি খনন শুরু করেছিলেন ১৫৭৯ খৃঃ শীতকালে এবং তা শেষ হয় ১৫৮১ খৃঃ শীতকালে। একটি মন্দির জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে নির্মান করান কুমিল্লাতে। মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খানকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল অমরমাণিক্যের সেনা ১৫৮৪ খৃঃ। সম্ভবত মুঘলদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে ত্রিপুরার সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গোমতী নদীর উৎস স্থানের কাছাকাছি পর্বত ঘেরা এক সমতল অঞ্চলে নতূন রাজধানী স্থাপন করেন অমরমাণিক্য। এইভাবেই অমরপুর শহরের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু আরাকানের মঘদের সঙ্গে চরমযুদ্ধে অমরমাণিক্যের পতন হয়। আরাকানী সৈনিকদের অনৈতিক যুদ্ধে তিনি তাঁর দুই পুত্রকে হারিয়ে শোকগ্রস্ত হয়ে মনুনদীর তীরে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় মুঘলরা কোনদিন ত্রিপুরাকে জয় করতে পারেনি। অমরমাণিক্যের জীবনী নির্ভর এক গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের নাম ছিল 'মুকুট'।

রাজধর মাণিক্য (১৫৮৬-১৬০০ খৃঃ)

মহারাজ অমরমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র রাজধর মাণিক্য ১৫৮৬ খৃঃ রাজ্যভার গ্রহন করেন। অনেকটা সম্রাট অশোকের মত ছিল রাজধরের জীবন। যৌবনকালে বহু যুদ্ধ করেছিলেন সম্রাট অশোক এবং রাজধর মাণিক্য দুজনেই। কিন্তু যেমন কলিঙ্গের যুদ্ধের পর অশোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে তেমনি রাজধরের জীবনেও সিংহাসনে বসার পর অনুরুপ ঘটনা ঘটে। তিনি সিংহাসনে বসার পব আর যুদ্ধে যাননি। অথচ তাঁর শাষণকালেই মুঘলেরা একবার চেষ্টা করেও ত্রিপুরা

জয় করতে অসমর্থ হয়েছিল। তিনি পরবর্তী জীবনে পরম বৈষ্ণব হন ও দান দক্ষিণায় জীবন কাটান। তিনি দুশো ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবৃত হয়ে ইষ্টনামে মগ্ন থাকতেন। অর্থাৎ মুসলমান আক্রমনের যুগে হিন্দুরা রাজধরের আশ্রয়ে স্বধর্ম রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

যশোধর মাণিক্য (১৬০০– ১৬২৩ খৃঃ)

রাজধর মাণিক্যের একমাত্র পুত্র যশোধর মানিক্য মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন। মুঘলরা ত্রিপুরা থেকে হাতির জন্য যশোধরের কাছে আবদার করেছিল। কিন্তু যশোধর সেই আবদার নাকচ করে দিয়েছিলেন। যার জন্য মুঘল আর ত্রিপুরার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মুঘলরা যশোধর মাণিক্য কে তাঁর পরিবার সহিত দিল্লীতে নিয়ে যায়। এই দুঃখজনক ঘটনা কে অবলম্বন করে বেদনাময়ী গান ও কবিতার রচনা করেন লোক কবিরা। বন্দী অবস্থায় যশোধর মানিক্য এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে তিনি মুঘলদের আধিপত্য কে অস্বীকার করেন ও মুঘল বাদশাহের কাছে তীর্থে বাকি জীবন কাটানোর অনুরোধ করেন। তাঁর বৃন্দাবন নগরীতে মৃত্যু ঘটে। মির্জা নাথান তাঁর "বাহারিস্তান-ই-ঘ্যাবী" পুস্তকে এই বেদনাদায়ক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান।

কল্যাণ মাণিক্য (১৬২৫-১৬৬০ খৃঃ)

যশোধর মাণিক্যের পর ত্রিপুরা রাজ্য ও উদয়পুর মুঘলদের অধীনে তিন বছর ছিল। সেই তিন বছর মুঘল বাহিনী উদয়পুরে লুটতরাজ ও জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছিল। সেই সময় মুঘলরা ত্রিপুরা রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর সমস্ত হাতি ও ধনসম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। উদয়পুরের সমস্ত বড় জলাশয়গুলি কেটে শুকিয়ে ফেলে। চৌদ্দদেবতার পূজা ও ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাও নিষিদ্ধ করে দেয়। মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কিন্তু দৈবীক কারনে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১৬২০-২১খৃঃ নাগাদ মুঘলরা ত্রিপুরা ছেড়ে যায়। ত্রিপুরায় তখন মাৎসান্যায় চলছিল। তখন রাজ্যের সব সেনাপতি ও মন্ত্রীদ্বয় কল্যাণদেব কে ত্রিপুরার

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কল্যাণদেব ছিলেন মহামাণিক্যের বংশধর। যশোধরও তাঁর পরে কল্যাণদেবের পক্ষে ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। কল্যাণ মাণিক্যের হাত ধরে ত্রিপুরা আবার উঠে দাঁড়ায়। তিনি সিংহাসনে আরোহন করেই প্রশাসনকে শক্তিশালী করে তোলেন। সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তাদের উদয়পুরে পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করান। উদয়পুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত সব জলাশয়গুলির সংস্কার করান। মঘদের দ্বারা বিনষ্ট হওয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের সংস্কার করান ও মন্দিরের পাশে বিশাল কল্যাণ সাগর নামক জলাশয়ের নির্মান করান। তিনি ত্রিপুরেশ ভৈরব ও কসবা কালী মন্দিরের ও সংস্কার করান। মুঘলরা আবার যখন ১৬৪১-৪২ খৃঃ সুজার নেতৃত্বে ত্রিপুরা আক্রমন করে, সেবার কল্যাণ মাণিক্যের সেনার সামনে মুঘলরা দারুনভাবে পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব করেন কল্যাণ মাণিক্যের জ্যাষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব যিনি পরে গোবিন্দমাণিক্য নামে খ্যাত হন। কল্যাণ মানিক্য একবার এক বিরাট তুলাপুরুষ দান সংঘটিত করেন। সেই দান যজ্ঞে অংশগ্রহন করতে সমগ্র ভারতবর্ষের পনেরশো ব্রাহ্মণ উদয়পুরে হাজির হন বেনারস, মথুরা, সেতুবন্ধ দেশ ও উড়িষ্যা থেকে। আশি বছর বয়সে ১৬৬০ খৃঃ (১৫৮২ শকে) কল্যাণ মানিক্যের মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ মাণিক্য (১৬৬০, ১৬৬৭-১৬৭৩ খৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'রাজর্ষি' উপন্যাসের রাজা ছিলেন রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্য। কিন্তু এক বছরের মাথায় গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রলোভনে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। তখন গোবিন্দমাণিক্য শান্তির উদ্দেশ্যে সিংহাসন ত্যাগ করেন ও ভাই কে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে যান। তিনি পরিবার ও অনুজ ভ্রাতা জগন্নাথদেব সহ আরাকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেই যাত্রায় হঠাৎ জগন্নাথদেবের এক পুত্র বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। নিজ্ কর্ত্তব্যপরায়নতার তাগিদে জ্যাষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদেবের প্রতি অনুজ্ঞায় জগন্নাথদেব নিজ্ পুত্রের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৬৬৭ খৃঃ নক্ষত্র রায় ওরফে নক্ষত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দদেব দ্বিতীয়বার ত্রিপুরার

সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোবিন্দমাণিক্য নিজে একজন অহিংসা মতবাদের প্রস্তাবক ছিলেন। তিনি নক্ষত্ররায়ের সন্তানদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেননি। নক্ষত্ররায়ের পুত্র উৎসব রায়কে তিনি তিনটি পরগনা জমিদারীর উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। তিনি যেমন বহু ব্রাহ্মন কে ভূমিদান করেছিলেন তেমনি দুজন মুসলমান ব্যক্তি একদিল কাজী ও আব্দুল গনি খোন্দকারকেও ভূমিদান করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ শিবের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এছাড়াও
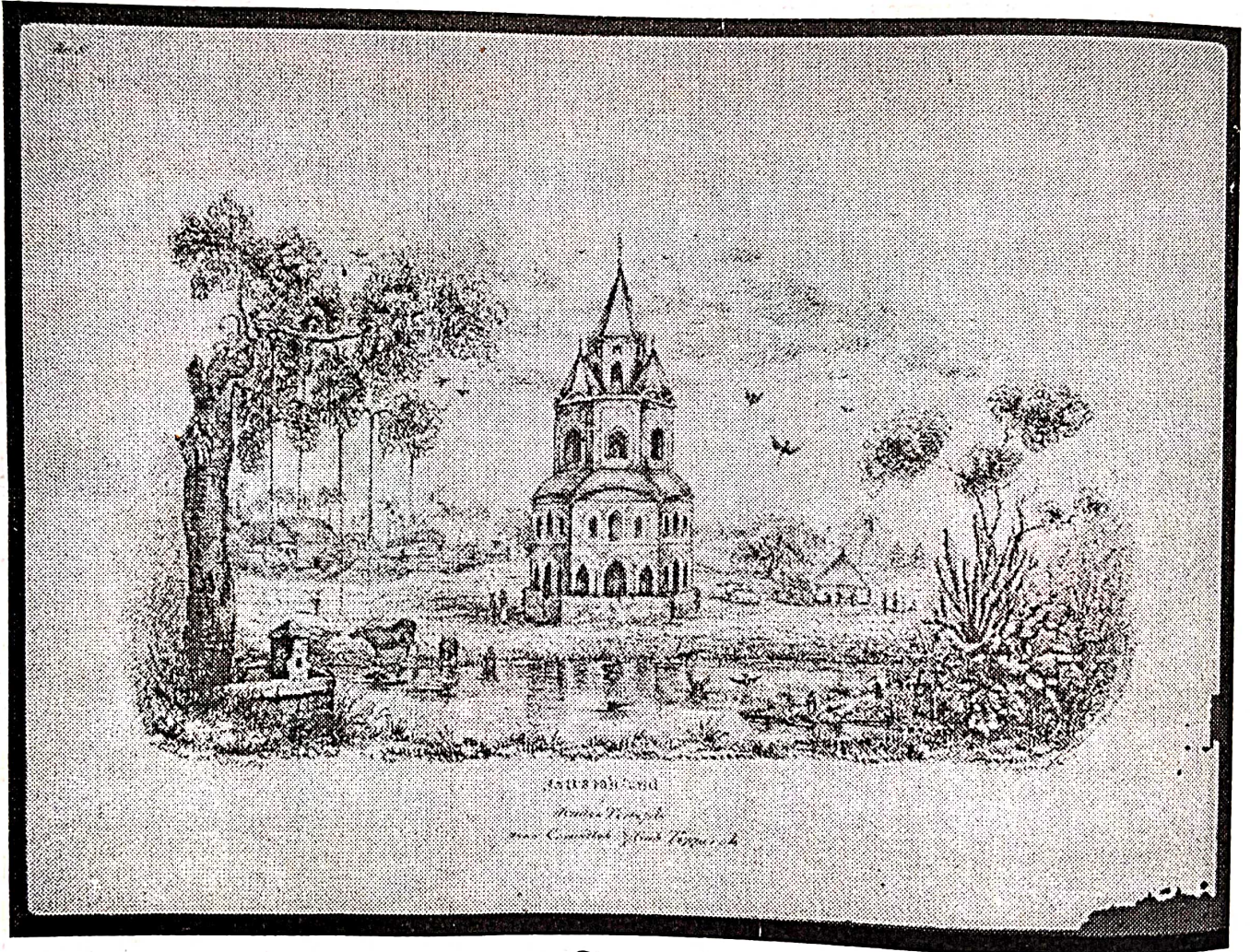
সতেরো রত্ন মন্দির, কুমিল্লা,বাংলাদেশ

ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে একাধিক মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বাংলাদেশে গোবিন্দ সাগর ও মহারাণী গুনবতীর নামে গুনসাগর খনন করান। বর্ষায় গোমতীর জলস্ফীতি থেকে ফসলী জমিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গোমতীর দুধারে বাঁধ তৈরী করান। তিনি ভূমিরাজস্ব অতি সামান্য পরিমানে ন্যস্ত করেন ও ঘোষণা করেন উনার পরবর্তী বংশধরগনও একই হারে কর গ্রহন করবেন প্রতি কানির কর

তিনি চার আনাতে ধার্য্য করে দিয়ে যান। শিক্ষা ও সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গোবিন্দমাণিক্য। তিনি রাজমালা তৃতীয় লহর রচনার উদ্যোগ নেন যা তাঁর পুত্র রামদেব পরবর্তীকালে সমাপ্ত করেন। তিনি কুমিল্লাতে মুঘল রাজপুত্র বন্ধু সুজার নামে সুজামসজিদও তৈরী করান। গোবিন্দমানিক্য বাংলা ভাষায় বৃহন্নারদীয় পুরানের অনুবাদ করান। জীবনের শেষদিকে গোবিন্দমাণিক্য বানপ্রস্থে গমন করেন পুত্র রামদেবের হাতে সমগ্র শাষন ব্যবস্থার হস্তান্তর করে। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক পিতা পুত্রের মত। সেই অমোঘ সম্পর্কের কথা মনে করাতে সে সময় সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁর ভাই জগন্নাথদেবের পাল্কিকে ঘোরানো হত।

রত্ন মাণিক্য (দ্বিতীয়) (১৬৮৪, ১৬৮৫-১৭১২ খৃঃ)

রামদেব মাণিক্যের পুত্র ও গোবিন্দ মাণিক্যের পৌত্র রত্নমাণিক্য দ্বিতীয় পূর্বসুরি রাজাদের ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত ও ক্ষমতাশালী না হলেও কিছু ব্যাতিক্রমী ঘটনার জন্য রত্নমাণিক্যের শাষনকাল চিরস্মরনীয়। রত্নমাণিক্য ১৬৮৭ খৃঃ কসবা মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করান। কুমিল্লাতে রাজ রাজেশ্বরী মন্দির স্থাপিত করেন এবং কুমিল্লাতেই বিখ্যাত সতেরো রত্ন মন্দিরের নির্মাণ শুরু করান। শৈল্পিক নৈপুন্যে ও এর বিশালতায় সতেরো রত্ন মন্দির ত্রিপুরার মানিক্য যুগীয় অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় বিশেষত্যের দাবী রাখে। অহোম রাজা রুদ্র সিংহের দূত অর্জূনদাস বৈরাগী ও রত্নকন্দলী শর্মা ত্রিপুরায় আগমন করেন মুঘলদের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুরাজ্যের একতার বানী নিয়ে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুরের চক্রান্তে রত্নদেবের মৃত্যু ঘটে ও ঘনশ্যাম ঠাকুর মহেন্দ্র মাণিক্য নামে ১৭১২ খৃঃ সিংহাসনে আরোহন করেন। এই মহেন্দ্র মাণিক্যের আমলেই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চর্তুর্দ্দশ দেবতা পূজার মন্ত্রাবলী ত্রিপুরী ভাষায় 'সূর্য্য পূজা খলায়মানি' নামকগ্রন্থে সন্নিবিস্ট হয়। 'সূর্য্যপূজাই' ককবরক ভাষার প্রাচীনতম লিখিত রুপ যদিও রাজমালাও ত্রিপুরী ভাষাতে লিপিবদ্ধ ছিল বলে স্বয়ং দ্বিতীয় লহরেই দেখতে পাওয়া যায়।

জগৎ মাণিক্য (১৭১৬-১৭২৯)

নক্ষত্ররায়ের বংশধর এবং তাঁর প্রপৌত্র জয়নারায়ন, জগৎমাণিক্য নাম গ্রহন করে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য কে চক্রান্ত করে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং মুঘল সেনার সাহায্যে ত্রিপুরা জয় করেন। কিন্তু উদয়পুরে সিংহাসনে আরোহন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। খণ্ডল থেকেই তিনি ত্রিপুরা শাষন করতে থাকেন। তাঁর সময় থেকেই ত্রিপুরার সমতল অঞ্চল রোশনাবাদ নামে নামকরণ করা হয়। জগৎ মানিক্য তাঁর শাষনকালে প্রজা সাধারনের চারিত্রিক গুনাবলীর উন্নতি সাধন কল্পে পদ্মপুরানের অন্তর্গত "ক্রিয়াযোগসার" গ্রন্থ রচনা করান।

কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৮-১৭৮৩)

মাহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রপৌত্র ও রামদেব মাণিক্যের চতুর্থপুত্র মুকুন্দ মাণিক্যের ঔরসে জয়ন্তিয়া রাজকুমারী প্রভাবতীর গর্ভজাত রাজকুমার কৃষ্ণমনিই হলেন বিখ্যাত কৃষ্ণ মাণিক্য। কৃষ্ণ মাণিক্যের শাষণকাল এক অদ্ভুত যুগ সন্ধিক্ষনের সাক্ষী যখন ভারতে মুসলমান শাষণের শেষ এবং ইংরেজ শাষণের শুরু হতে যাচ্ছিল। কৃষ্ণমাণিক্য ১৭১৭ খৃঃ জন্মগ্রহন করেছিলেন। উনার সম্পূর্ন জীবন সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে "কৃষ্ণমালা" নামক এক গ্রন্থের রচনা করান পরবর্তী রাজন দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৪ খৃঃ)। এই গ্রন্থ রচনার সময় তথ্য প্রদান করেন শ্রুতিধর জয়ন্ত চন্তাই এবং লিপিবদ্ধ করেন কবি ব্রাহ্মণ দ্বিজ রামগঙ্গা। ইতিহাসবিদরা কৃষ্ণ মাণিক্যকে ত্রিপুরার রানা প্রতাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। কারণ চির জীবন যে সংগ্রাম ও দুর্ভোগের মধ্যে তিনি কাটিয়েছেন তা ত্রিপুরার অন্য কোনও নৃপতিকে ভোগ করতে হয়নি। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরার সার্বভৌমত্বের উপর বিভিন্ন রকম অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় চক্রান্তের আঘাত নেমে এসেছিল। কৃষ্ণমাণিক্যের জ্যাষ্ঠভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্যকে যখন মোগল সেনা মুর্শিদাবাদে বন্দি করে নিয়ে যায় তখন ইন্দ্র মাণিক্য যুবরাজ কৃষ্ণমনি (কৃষ্ণমাণিক্যের রাজা হওয়ার পূর্ববতী নাম) কে সপরিবার নিরাপদ স্থানে গমন

করার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন কারণ রাজ্যে নানাবিধ উপদ্রব যে আসন্ন তা তিনি বুঝেছিলেন। কৃষ্ণমাণিক্যকে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করবার জন্য সে সময় চাররকম বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রথমত উচ্চভিলাষী হিংসুক আত্মীয় জগৎ, জয় এবং দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য, দ্বিতীয়ত লোভী আক্রমণপ্রবণ নবাবি মুসলিম সেনা, তৃতীয়ত কিছু অসন্তুষ্ট মন্ত্রীবর্গ এবং চতুর্থত কুকি লুসাই আদিবাসীগন। এদের সবার বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত করার পর ১৭৬০ খৃঃ কৈলাগড়ে (কসবা) সভাসদ ও পাত্রমিত্রের অনুরোধে কৃষ্ণমাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেন। কৈলাগড়েই কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার নতূন রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু এরপরও পূর্ণভাবে শান্তি পাননি কৃষ্ণমাণিক্য কারণ তখন এক অজানা নতূন বিপদের অভূদ্যয় ঘটল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির নামে। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে কুটনৈতিক যুদ্ধে কৃষ্ণমাণিক্য যখন সুস্থিতি আনলেন তখন রাজ্যের সকলের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে উৎসবের রুপ নেয়। কৃষ্ণমাণিক্যও তাঁর পূর্বসুরিদের মত বহু মন্দির স্থাপন করান যেমন কুমিল্লাতে রত্নমাণিক্য দ্বিতীয়ের অসমাপ্ত মন্দির তৈরী করা, আখউড়ার রাধানগরে রাধামাধব মন্দিরের স্থাপন করান, জলাশয় খনন করান। কৃষ্ণমানিক্য ত্রিপুরার হৃত গৌরব ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে ১৭৮৩ খৃঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহারানী জাহ্নবী দেবী (১৭৮৩-১৭৮৫)

কৃষ্ণ মাণিক্যের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সতী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি তাকে সতী হওয়া থেকে বিরত করে। ব্রিটিশরা তাকে কৃষ্ণ মাণিক্যের উত্তারিধীকারী হিসেবে মান্যতা দেন। জাহ্নবী দেবী অষ্টাদশ শতকের ভারতে এক বিরল প্রতিভাশালী মহিলা ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন এবং প্রতিভাময়ী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনকে অত্যন্ত নিপুনভাবে পরিচালনা করেছিলেন। জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা কুমিল্লায় 'রানীর দিঘী' দেখতে পাই। কুকি উৎপাতের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য উদ্যোগ নেন। সেই সময় এক ভয়াবহ বন্যার

হাত থেকে রাজবাসীকে উদ্ধার করতে তিনি ও তাঁর প্রশাসন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রাচীন কালে ত্রিপুরী রমনীরা

রামগঙ্গা মানিক্য (১৮০৪-১৮০৯খৃঃ)

রামগঙ্গা মাণিক্য দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্যের পুত্র রাজমালা চতুর্থ লহরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দূর্গামনি উজির রাজমালা চতুর্থ লহরের লেখক ছিলেন। রামগঙ্গা মাণিক্য বৃন্দাবনে রাসবিহারী শ্রী কৃষ্ণের এক মন্দির নির্মান করান। বার্মিজ আক্রমনের হাত থেকে পূর্ববঙ্গকে রক্ষা করতে সেদিন রামগঙ্গা মাণিক্যের সৈন্য ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯)

রামগঙ্গা মাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ১৮৩০ খৃঃ ত্রিপুরার অধীশ্বর হন। তিনি ১৮৩৮ খৃঃ পুরাতন আগরতলা থেকে নতূন আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬)

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পুত্র ও মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য। ঐতিহাসিকদের মতে বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি। তিনিই প্রথম ব্রিটিশ ভারতের অনুকরনে প্রশাসনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষাপ্রবনচিত্ত নব্যরুচিমান। তিনি চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য ও ফটোগ্রাফি, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের গুনীরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আমলেই প্রথমবার আগরতলায় ইংরাজী হাই স্কুলের স্থাপনা হয় যা পরবর্তীকালে উমাকান্ত একাডেমী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর আমলেই ত্রিপুরায় লিখিত আইনের প্রচলন শুরু হয়। রাজ্যে তাঁর আমলেই হাসপাতাল, ডাকঘর এবং বসন্ত রোগ ইত্যাদির শুরু হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী বুদ্ধি সম্পন্ন এক কুটনীতিজ্ঞ। একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও অত্যন্ত দৃঢ় স্বদেশী ভারতীয় ভাবাপন্ন রাজা। তাঁকে বাংলার বিক্রমাদিত্য হিসেবে গন্য করা হত সেই যুগে। গুনগ্রাহী এই রাজার সভা সেদিন ভারতীয় পণ্ডিত, শাস্ত্রকার, গুনী শিল্পীর আগমনে পরিপূর্ন। কাশ্মীর থেকে গোয়ালিয়র উত্তর ও পূর্বভারতের সমস্ত গুনী ব্যক্তির কারনে সেদিন বীরচন্দ্রের দরবার সমগ্র ভারতে শ্লাঘার বিষয় ছিল। মহারাজ ভারতীয় ফটোগ্রাফি চর্চার অগ্রগন্য ব্যক্তি ছিলেন। উনার ফটোগ্রাফি চর্চা আজ বিশ্ব বিখ্যাত। চিত্রকলা বিদ্যায়ও অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বহু সঙ্গীত ও সাহিত্যের তিনি রচনা করে গেছেন। তিনি ত্রিপুরী, মণিপুরী এবং উর্দ্দূ মাতৃভাষার ন্যায় আলাপ করতে পারতেন। তাঁর পৃষ্ঠাপোষকতায় ত্রিপুরায় হোলি উৎসব অনন্যতা লাভ করে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'হোরি', 'ঝুলন', 'প্রেমমরিচীকা', 'উচ্ছাস', 'অকাশকুসুম', 'সোহাগ', । তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন এবং 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ মুদ্রনের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর সব পুত্র কন্যা অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁর কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ছিলেন বাংলা কবিতার অগ্রগন্যা মহিলা কবি। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভবিষ্যৎ এর একজন মহান কবির ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে— 'জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তাঁর

প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা।" মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কালের এক সুযোগ্য সাহিত্য আলোচক ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র সর্ব গুনে গুনান্বিত রাজা ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও দানের কথা ভারত বিশ্রুত। তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে ৩৪ বছর রাজত্ব করে কলকাতায় মহানির্বাণ নেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য

রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯)

বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যাষ্ঠপুত্র হিসেবে রাধাকিশোর ১৮৯৬ খৃঃ ১২ ডিসেম্বর ত্রিপুরার মাণিক্য হন। তিনি ১৮৫৬ খৃঃ জন্মগ্রহন করেছিলেন। তিনি আজও একজন কল্যাণকামী দানবীর রাজা হিসেবে বিখ্যাত। রাজা হবার পর তিনি সমগ্র প্রশাসনকে চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে

যান। তাঁর আমলে ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মন ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রশাসনিক কাজকর্মের তদারকির জন্য ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মন ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যোগ্য ব্যক্তি। ধনঞ্জয় দেববর্মন যে ভাবে রাজ্য প্রশাসনের রুপরেখা তৈরী করে দিয়েছিলেন তার উপরে ভিত্তি করেই শেষ রাজা বীরবিক্রমেরও প্রশাসনিক সংস্কার চলেছিল। সুতরাং আধুনিক ত্রিপুরার প্রশাসনের সংস্কারে রাধাকিশোরের সঙ্গে ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মনের নামও অনিবার্য্যভাবে এসে যায়। ১৮৯৭ খৃঃ প্রবল ভুমিকম্পে তৎকালীন আগরতলার মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নির্মিত রাজপ্রাসাদটি ব্যবপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯৯খৃঃ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নির্মানকার্য্য শুরু হয়। ১৯০১ খৃঃ কলকাতার ভারত সংগীত সমাজ মহারাজ রাধাকিশোরকে সম্বর্দ্ধনা দেয়। ১৯০১ খৃঃ রাধাকিশোর আগরতলায় একটি অবৈতনিক কলেজ আরম্ভ করান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে কলেজটিকে বন্ধ করতে বাধ্য হন। সেদিন রাধাকিশোর বলেছিলেন— "হিন্দু রাজা বিদ্যা দান করে, ব্যবসা করে না" কারণ ব্রিটিশ সরকার রাধাকিশোরকে কলেজটিকে বৈতনিক করার জন্য অনবরত চাপ দিচ্ছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ রাধাকিশোর উদয়পুর পরিদর্শনে যান। সেখানে পূর্বসুরিদের কীর্তি কাহিনী দেখে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং বাবু চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কে সমস্ত প্রাচীন ভবন মন্দির হত্যাদির গায়ে উৎকীর্ন শিলালিপি তাম্রলিপি ইত্যাদি সংরক্ষনের নির্দেশ দেন। ১৯০৩ খৃঃ একটি টেকনিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন যাঁর নাম ছিল উডবার্ন টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯০৩ খৃঃ মাহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। ঠাকুর দীনবন্ধু নাজিরের কন্যার নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় যার নাম ছিল 'তারাসুন্দরী ভাণ্ডার'। পূর্বতন মহারাজাদের অনুসৃত পথেই রাধাকিশোরের আমলে কুড়িটির মত জলাশায় এবং একাধিক পুল নির্মান করা হয়। রাধাকিশোরের পৃষ্ঠপোষকতায় "বৃহন্নারদীয় পুরান" পুনঃ মুদ্রিত করা হয়। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে আর্থিক দান দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লন্ডনে বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান দেন। কোলকাতার

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজ বা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ নির্মানে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। বারানসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নির্মানেও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। বাংলার অন্ধ কবি হেমচন্দ্র ও লেখক দীনেশচন্দ্র সেনের আর্থিক অসচ্ছলতার সময় নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। কাশী ভ্রমনকালে এক মোটর দুর্ঘটনায় কাশীরাজের নন্দেশ্বর কুঠীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাধাকিশোরের শাষণকাল কল্যানমূলক কাজের নিরেখে অভুতপূর্ব ছিল। যেখানে ১৮৯৬ খৃঃ তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে সারা রাজ্যে ৩৬টি স্কুল ছিল, ১৯০৯ খৃঃ স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৪টি তে। সেভাবেই নয়টি হাসপাতাল থেকে তেরোটি হাসপাতাল তৈরী হয়। সারা রাজ্যে দশটি পোস্ট অফিস তৈরী হয়। রাজ্যের আয় ৪,৭৪,৪৬৮ টাকা থেকে ১০,০৪৫৩৬ টাকা পৌছুয়। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ন করে তোলেন। রাধাকিশোরের অন্যান্য অবদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সঙ্গীত প্রবেশিকা"র জন্য মাসিক ৫০টাকা মঞ্জুর, বঙ্গদর্শনের জন্য মাসিক ৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য, বেঙ্গল টেকলিকেল ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানাগারের জন্য আর্থিক সাহায্য।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩ খৃঃ)

পিতা মহারাজ রাধাকিশোরের আকস্মিক মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর ১৩ মার্চ ১৯০৯ খৃঃ রাজ সিংহাসনে বসেন। বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য ছিলেন এক উচ্চকোটির চিত্রশিল্পী। তাঁর অংকিত তৈলচিত্র 'সন্ন্যাসী', 'ঝুলন', 'বংশীবাদন' ইত্যাদি ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সাহিত্যেরও সমান গুনীরসিক ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর। তিনি বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। চিত্রশিল্প ছাড়াও সেতার, এস্রাজ, মণিপুরী খোল ও বাঁশীতে বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন এক সুদক্ষ শিল্পী। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে ইংরেজ সরকার তাঁর পারিবারিক "মাণিক্য বাহাদুর" উপাধি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমুন্নত আত্মমর্যাদাবোধ ও কাঠিন্যের কাছে পরাজয় স্বীকাব করে ইংরেজ সরকার কে মাণিক্য বাহাদুর পদবী ফিরিয়ে দিতে হয়। ১৯০৯ খৃঃ কাশীপুর উদ্যানের সুপারিন্টেনডেন্ট যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীকে সেরিকালচারে

প্রশিক্ষনের জন্য জাপান পাঠানো হয় এবং উনার সহযোগী বীরলাল ঠাকুর কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য রাজশাহীতে পাঠানো হয়। ১৯১০ খৃঃ মহারানী প্রভাবতী দেবী ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল চত্বরে একটি মেডিকেল কলেজের সূচনা করেন যার নাম রাখা হয়েছিল এডওর্য়াড মেমোরিয়াল মেডিকেল ইন্সটিটিউশন। ১৯১০ খৃঃ এক আদেশে রিয়াং সমাজের চৌদ্দজন সমাজপতির কর মকুব করা

স্টুডিওতে চিত্র অঙ্কনরত বীরেন্দ্র কিশোর

হয়। ১৯১২ খৃঃ মহারাজ সভাসদদের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যানপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া ও বিলোনিয়া পরিদর্শনে যান। ১৯১৩ খৃঃ লর্ড কার মাইকেল এর হাত ধরে বটতলার প্রথম হাওড়া নদীর উপর পুল তৈরী করা হয়। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য সহধর্মিনী মহারাণী প্রভাবতী দেবী পাঁচ হাজার টাকা দান দিয়েছিলেন লেডি হার্ডিঞ্জ এর অল ইন্ডিয়া চেরিটেবল ফান্ডে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মহারাজ ১০০০০০

টাকা দান করেন ব্রিটিশ সরকারের তহবিলে। এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় তিনি দান করেছিলেন নিয়মিত। চল্লিশ জন যুবককে ত্রিপুরা থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্যও তিনি পাঠিয়েছিলেন। তিনি কুঞ্জবন প্রাসাদ, লক্ষীনারায়ন মন্দির ও দূর্গাবাড়ী মন্দিরের নির্মান করান। ১৯১৫ পঁচিশ ডিসেম্বর বেনারসে ভারত ধর্ম মহামণ্ডল মহা অধিবেশন সংঘটিত হয়। সেখানে বেনারসের পণ্ডিতগন বীরেন্দ্র কিশোরকে 'ধর্ম-ধুরন্ধর' উপাধিতে ভূষিত করেন। পূর্ব বাংলার সারস্বত সমাজ তাকে 'সারস্বত নিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ খৃঃ প্রতিভাবান যুব সম্প্রদায়কে প্রশাসনে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস এর সূচনা করেন। ১৯১৬ খৃঃ তিনি হওড়া নদীর বাক্ দক্ষিন পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেন আগরতলা শহরকে জলপ্লাবনের হাত থেকে বাঁচাতে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের উদ্যোগে ত্রিপুরায় বানিজ্যিকভাবে কমপক্ষে চল্লিশটি চা বাগানের আরম্ভ হয়। তাঁর আমলেই বার্মা অয়েল কম্পানিকে ত্রিপুরায় পেট্রোলিয়াম এর জন্য অনুসন্ধান করানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বীরেন্দ্র কিশোরের বুদ্ধিমত্তা, সংগীত, কলা ও বিজ্ঞানে তাঁর মেধা ও বিশুদ্ধতা তাঁকে সমসাময়িক অন্যান্য গড়পড়তা নৃপতি বর্গের থেকে অনেক উপরে স্থান করে দিয়েছিল।

“ত্রিপুর হৃদয় চূড়ামণি মহারাজ বীর বিক্রম”

কল্যাণময়ী ত্রিপুরার কল্যান আদর্শ ছিলেন মহারাজা স্যার বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস গুটি কয়েক ব্যাতিক্রমী ব্যক্তির ইতিহাস। সমগ্র বিশ্বে প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও ব্যক্তি বা কোনও ঘটনা নির্দিষ্ট কোনও এক অঞ্চলের পরিচয় জ্ঞাপক স্বরুপ হিসেবে

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর

আত্মপ্রকাশ করে তার বিশিষ্ট গুণাবলীর জন্যে। ছত্রপতি শিবাজী বললে যেমন সমগ্র মারাঠী রাজ্যের কথা মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্গ সভ্যতার অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব, গুরু গোবিন্দ সিংহ যেমন পাঞ্জাবের বীরত্বের প্রতীক, রানা প্রতাপ সমগ্র রাজপুতানার শৌর্য্যের ধ্বজাধারী তেমনী ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় শেষ রাজন মহারাজ বীরবিক্রমও ত্রিপুরা রাজ্যের অমর প্রতীক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে অনন্তের যাত্রাপথে। এই তুলনা কোনও অংশেই অতিরঞ্জিত নয় শুধুমাত্র এই কারনে যে আজও ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষের অন্তরে মহারাজ বীরবিক্রম সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা ও সমীহ জাগরিত, তা আজও ব্যাপক এবং বীরবিক্রমের প্রতি এই গণচেতনা প্রত্যেকদিন প্রবল হতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমের আলোচনাস্থলগুলিতে। সুতরাং মহারাজ বীরবিক্রম যে ত্রিপুরার হৃদয়ে অবস্থিত, একথা বলতে আর কোনও দ্বিধা নেই। ত্রিপুরার রাজলাঞ্জনে উৎকীর্ণ বাণী "কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং", প্রাচীনকাল থেকেই নিষ্ঠা সহকারে স্পষ্ট ঘোষণা করছে এ রাজ্যের মহানব্রত। যার অর্থ বীর্যই সবকিছুর সার। কোনও প্রকার ছলনা চাতুরীর কৌশলে নয়, নিখাদ বীরত্বের দ্বারা সত্যকে সদা রক্ষা করার এক মহান অঙ্গীকার।

ত্রিপুরার সর্বকালের সেরা হিতাকাঙ্খী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে যা ১৩০৮ (বাং) শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে আদর্শ হিন্দু রাজার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে— 'বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই স্বদেশী সমাজের আদর্শ উন্নত ও সবল করিয়া রাখা দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে দ্বিগুণতর কর্ত্তব্য হইয়াছে। ... রাজারাই দেশের বুধমন্ডলীকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বের হিতসাধনকল্পে সকল প্রকার ধর্মালোচনাকে সজীব করিয়া রাখিবেন-এবং হিতকর প্রথা সযত্নে প্রচলিত করিয়া স্বরাজ্যে এবং চতুর্দ্দিকে সামাজিক উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন করিবেন।" স্বদেশী রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয়দের অন্ধানুকরণে যে কতটুকু বিচলিত ছিলেন উপরের বক্তব্যটি থেকে স্পষ্ট। তৎকালীন

যুগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণীর ভারতীয়রা নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে স্বদেশের সবকিছুকেই হীন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। চিন্তা, চেতনা, আচার, আচরণে সবকিছুতেই নকলনবীশ ভারতীয়রা সমাজে একপ্রকার অবক্ষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন

মহারাণী অরুন্ধুতী দেবী

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষার্থে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন উক্ত প্রবন্ধে। কিন্তু ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ সর্বদাই হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষণ তথা পোষণে কুন্ঠিত হননি। হিন্দু সভ্যতার আদর্শকে সবসময়ই মস্তকোপরি মুকুটের ন্যায় সম্মান করেছেন বীরত্বের সঙ্গে। এখানেই ত্রিপুরার বাণী সার্থক হয়েছে যুগ যুগ ধরে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই ঘোষণা করতে পিছপা হননি এই বলে যে—

“ভারতীয় পুরান, কাব্যপাঠ করে প্রাচীনকালের রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চধারণা মনে জন্মায়, সেই সব গুণাবলী ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে দেখেছি।” অর্থাৎ এক স্বাভাবিক প্রজাহিতৈষী মানসিকতা সবসময়ই কাজ করেছিল ত্রিপুরার রাজাদের অন্তরআত্মায়, প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষেই হোক যা ছিল অকৃত্রিম। সনাতন ধর্মের মহৎ আদর্শকে চরম প্রতিকুলতার মধ্যে জীবন দিয়ে রক্ষা করার যে ঐতিহ্য ত্রিপুরার রাজারা স্থাপন করে গেছেন যুগ যুগ ধরে এবং যাকে ভিত্তি করে নর নারায়ণের সেবায় সিংহাসনারুড় হতেন, সেই কাঙ্খিত যুগের যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজ বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর।

মহারাজ বীরবিক্রম ১৯০৮ খৃঃ ১৯ আগস্ট,৩রা ভাদ্র ১৩১৮ ত্রিপুরাব্দে কৃষ্ণ জন্মষ্টমীর দিন পিতা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও মাতা মহারানী অরুন্ধুতী দেবীর কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন এক অদ্ভুত ঐশ্বরিক অনুভূতি সবার মনকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই রাজপরিবার ও রাজ্যবাসীর মন এক মহামানুষের আগমনের আভাসে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। সে সময় প্রবীন ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই মনে হয়েছিল যেহেতু রাজপুত্র কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্মেছেন, এই ঘটনা কাকতালীয় হতে পারেনা, নিশ্চিত কোন দৈবিক নির্দেশ নিহিত থাকতে পারে এই সন্নিপাতে। শৈশবকাল থেকেই বীরবিক্রম ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রত্যুপন্নমতিত্ব সম্পন্ন। প্রথম দিকে বীরবিক্রমের অন্যতম প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন শ্রী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এনার কাছ থেকে প্রথমে বাংলা, সংস্কৃত শাস্ত্রীয় ধর্মপালন ও চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে সম্যকভাবে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই অধীনস্থ একজন রাজকর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন অনুকূল চন্দ্র। কিন্তু মহারাজ বীরবিক্রম তাকে যে ব্যবহারের মাধ্যমে চিরকাল সম্মান জানিয়ে এসেছেন তা আমাদের প্রাচীন বৈদিক যুগের গুরু শিষ্যের পরম্পরা কে মনে করিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে প্রয়াত শ্রী রবীন সেনগুপ্ত তাঁর—“ত্রিপুরার রাজন্যযুগের শিল্প স্থাপত্য ও সংস্কৃতি ” প্রথম খন্ড বইতে লিখেছেন “একদা শৈশবের প্রাইভেট্ শিক্ষক বাবু অনুকূল মুখার্জী দেওয়ানকে যে ভাষায় সম্বোধন

করে চিঠি দিয়েছেন এতে একদা শিক্ষাগুরুর প্রতি প্রকৃত একজন ছাত্র বা শিষ্যর সুচারু শ্রদ্ধা নিষ্ঠা জানানোর দিকটা ফুটে উঠছে।" পরবর্তীকালে প্রশাসনিক পরিচালনার শিক্ষা আরম্ভ হয় ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার লিউটিনেন্ট কর্ণেল ও সি
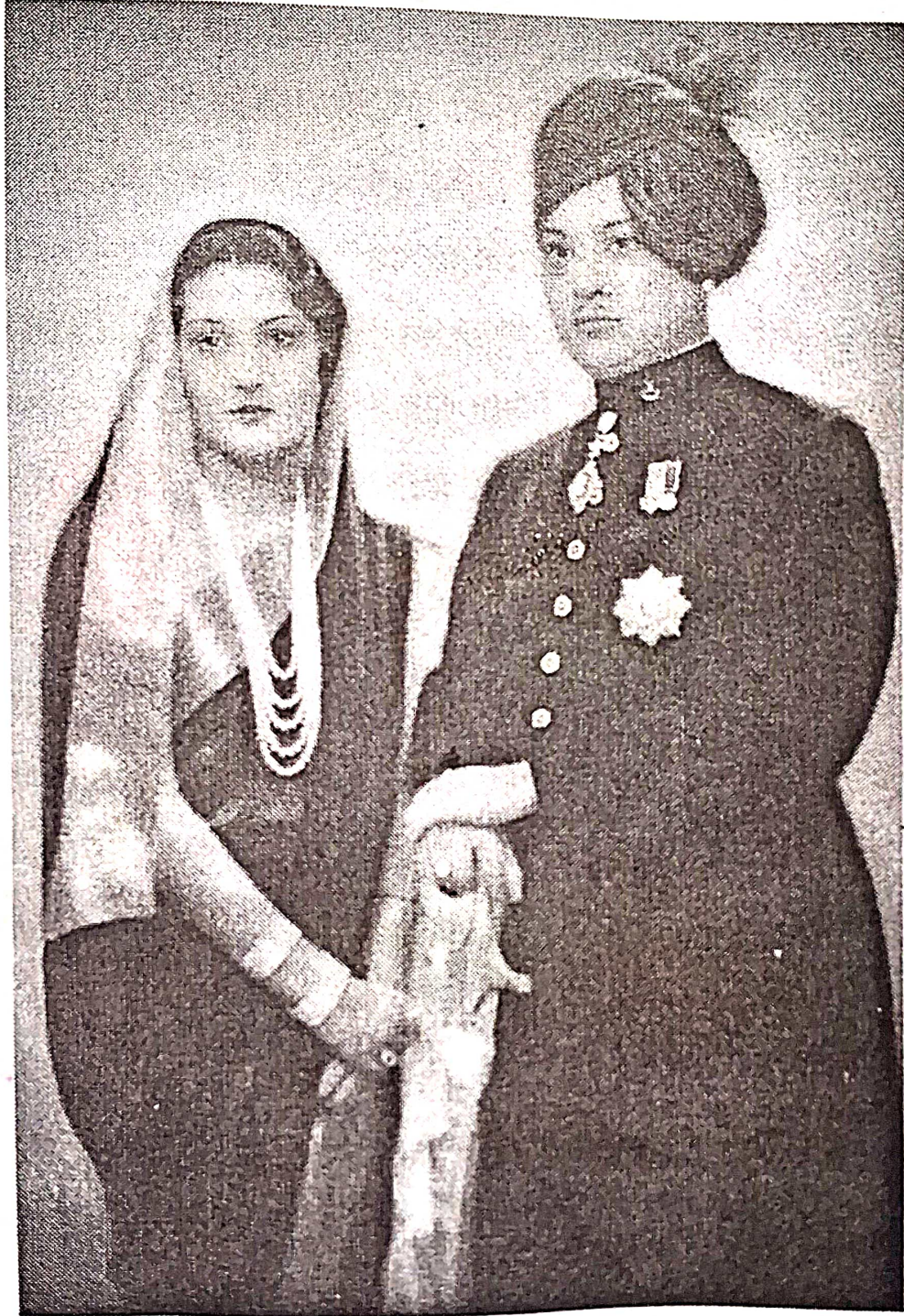
মহারাজা বীরবিক্রম ও মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী

পুলির নেতৃত্বে এবং এই জন্যে বীরবিক্রমকে শিলঙে পাঠানো হয়। পুলির শিক্ষকতা মহারাজের রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন আগ পর্যন্ত চলেছিল। আর বীরবিক্রম সামরিক

শিক্ষার জ্ঞান লাভ করেছিলেন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ এ জে ড্যাশ এর তত্ত্বাবধানে। সামরিক শিক্ষা মহারাজকে একজন প্রকৃত সৈনিক করে তুলেছিল যার প্রায়োগিক রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর সৃষ্টিকরা ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস ও অন্যান্য সামরিক সংগঠন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বীরত্বের সঙ্গে কুখ্যাত জাপানী সৈন্যদের পরাস্ত করে সমগ্র বিশ্বে সমাদার কুড়িয়েছিল। মহারাজ বীরবিক্রমের এই প্রশাসনিক ও সামরিক শিক্ষা শুধুমাত্র তাত্ত্বিকই ছিল না এতে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগ ছিল। সেই সুত্রে তাকে সমগ্র রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘুরতে হয়েছিল যা তাকে ব্যাপক সহায়তা করেছিল পরবর্তী জীবনে। এই শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের জন্যে তিনি প্রাচীন উদয়পুরের রাজবাড়ী, কৈলাসহরের ঊনকোটি তীর্থ দর্শন করেছিলেন যা তাকে ভীষণভাবে আবেগমথিত করে তুলেছিল। তিনি প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের সংরক্ষণের জ্ঞানও তিনি পান। এইভাবে তিনি ত্রিপুরার ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পরেন। তখনও পিতা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর জীবিত। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের মনোরম সাংস্কৃতিক মন্ডল তাঁকে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রশিল্প এমনকি নাট্যক্ষেত্রেও তাঁর সহজাত প্রবৃত্তিকে পরিশীলিত করে তোলে। এই কারণেই তিনি ছিলেন এক উচ্চাঙ্গ সেতারী এবং ধ্রুপদী সংস্কৃতির এক গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। একদিন মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ছবি আঁকায় মগ্ন ছিলেন। সেদিন এক কয়েদির ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তির দিন ছিল। যখন নাবালক যুবরাজ বীরবিক্রম এই করুন ঘটনার কথা জানতে পারলেন তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ কয়েদীর ফাঁসি রদ করবার আর্জি নিয়ে পিতা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের দরবারে উপস্থিত হলেন। যুবরাজের কাতর আবেদনে শেষে সাড়া দিয়ে নিজের হাতের রুমালে ফাঁসির আদেশ রদ করবার হুকুম জারির কথা লিখে পাঠিয়ে দিলেন যুবরাজ বীরবিক্রমের হাত দিয়ে। বীরবিক্রম অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অশ্বের পীঠে সওয়ার হয়ে জেলখানায় হাজির ফাঁসি রদ করাতে। এরই মধ্যে কয়েদী ফাঁসি কাষ্ঠের জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তুত। চারিদিকে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি, যুবরাজ আসছেন

ফাঁসি রোকো বলে আদেশ করা হল। এইভাবে সেদিন সেই আসামীর ফাঁসি রদ করালেন যুবরাজ বীরবিক্রম। এই ঘটনা রাজপরিবারভুক্ত প্রবীণ ব্যক্তিরা এখনও নিজেদের স্মৃতির মণিকোঠাতে সঞ্চিত রেখেছেন। অসাধারণ এই ঘটনা ভবিষ্যতের এক মহান মানবতাবাদী রাজার দুর্লভ চিত্র তুলে ধরছে আমাদের সামনে। এই ঘটনা প্রমাণ করে মহারাজ বীরবিক্রম শুধুমাত্র একজন প্রশাসকই ছিলেন না, তার অন্তরে ছিল দয়া, সমব্যাথী, মানবিকতার এক উচ্চতর দেবোত্তম মূল্যবোধ। যখন মহারাজ বীরবিক্রমের ১৫ বছর বয়স তখন অকস্মাৎ তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। রাজখান্দানের কুলাচার অনুযায়ী কুড়ি বছর না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যাভিষেক করা যায় না। সুতরাং রাজ্য পরিচালনার জন্য নাবালক রাজার পক্ষে এক শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। সেই সময় শাসন পরিষদের সমস্ত পদাধিকারীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সম্মান জানিয়েছেন এবং তাদের কাজে আস্থা রেখেছিলেন। এরকম একজন ব্যাতিক্রমী দৃঢ়চেতা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানও ছিল স্মরণীয় ঘটনা। সেদিন ভোর থেকেই বৈতালিকগণের বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারনে আগরতলার আকাশ বাতাস মুখরিত। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে থাকেন বৈতালিকগণ। শাস্ত্রানুমোদিত চন্দ্র বংশীয় হিন্দু রাজাদের পৌরানিক রীতি অনুযায়ী শাস্ত্রাচার কুলাচার ও দেশাচারের সংমিশ্রণে এক অভূতপুর্ব আবহে জনতার মাঝে বর্তমান চিলড্রেন পার্কের পুর্বে নবনির্মিত অভিষেক মন্ডপে সিংহাসনারূঢ় হন। লক্ষ জনতাকে সাক্ষ্মী রেখে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী আর কোনও রাজার এভাবে রাজ্যাভিষেক হয়েছে কিনা ভারতবর্ষে সন্দেহ হয়। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সেদিন অসম-বেঙ্গল রেলওয়েজের আশি হাজার টিকিট বিক্রয়ের রেকর্ড সর্বত্র আলোচনার বিষয় ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন ইংরেজী দৈনিক "The Statesman" লিখেছেন— "The whole epitomized the imme-morial weath & splendour of the East." মহারাজ বীরবিক্রমের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের বর্ণনা এই পরিসরে করার একমাত্র কারণ হচ্ছে তৎকালীন

যুগে ত্রিপুর রাজনন্দনের প্রতি ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জনগণের যে কতখানি আন্তরিকতা ও গর্ববোধ ছিল তা বোঝার জন্য। রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী এক বছরে ভারতবর্ষ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবর্ধনার ঢেউ আছড়ে পড়ল। এমনি এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া' কুমিল্লা শহরে ৮ই ভাদ্র ১৩৩৮ ত্রিং। সেখানে প্রদত্ত মহারাজের ভাষণে এক উদার দেশপ্রেমিক, উন্নয়নকামী ব্যক্তিত্বের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তাঁর সেই ভাষণ বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক। একজন প্রকৃত দেশনায়কের মত সেদিন তিনি বলেছিলেন— 'যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই, প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরনেই পর্য্যবসিত; এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য-মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা ও প্রণয়ের দাবি রাখে।'

পরবর্তীকালে মহারাজের মন্ত্রী পরিষদে মৌলভী তমিজদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরীর নিযুক্তি ও রাজসভার প্রিভি কাউন্সিলে মুন্সী আব্দুল আজিজ ও মৌলভী আব্দুল মুখির মজুমদারের অন্যতম সদস্যরূপে নিয়োগে বলা যায় মহারাজার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে ত্রিপুরার উন্নয়নের উদ্দেশ্য রূপায়িত হয়েছিল। ১৯৩১ খৃঃ ত্রিপুরার সেন্সাসে হিন্দু জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটলেও সন্নিহিত জেলাগুলি যেমন কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় হিন্দুর জনসংখ্যা কুড়ি শতাংশের অধিক ছিল না। এদিকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যত ব্যাপক রুপ ধারণ করছিল ততই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেড়ে উঠছিল। ১৯৪১ খৃঃ ঢাকা জেলার রায়পুরায়ে কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজারে হাজারে হিন্দু শরনার্থীর ঢল নামে আখাউড়া স্টেশনে। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গন্থে উক্ত বিষয়ে যা বর্ণিত — "এদিকে রাজধানীতে এক সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে তখন স্বর্গীয়

মহারানী রাজমাতার শ্রাদ্ধবাসরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় মহারাজও সপরিষদ উপস্থিত রয়েছেন। পারলৌকিক কৃত্যাদির তাৎপর্য্য এবং অধ্যাত্মতত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত নিবিষ্ট-ঠিক এই সময়ে আখাউড়া স্টেশনমাস্টার টেইলার সাহেব স্বয়ং এসে রাজ দরবারে জরুরী এত্তেলা দিয়ে ততোধিক জরুরী পরিস্থিতির সংবাদ নিবেদন করলেন। রাজমন্ত্রী ও সচিববর্গের সহিত পরামর্শ করে নিমেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। রাজধানীর অফিস-আদালত-বিদ্যালয়াদি সরকারী ভবনগুলির দুয়ার খুলে দিয়ে শরনার্থীদের জন্য যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করে ব্রিটিশ-ভারতীয় দুর্গত নাগরিকদের স্বরাজ্যে নিয়ে আসার আদেশ মহারাজা বীরবিক্রম প্রদান করলেন।’ এরকম দুর্যোগপূর্ণ সময়ে যখন বাংলার প্রাদেশিক সরকারের কর্ত্তব্য ছিল দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসা, তারা সেটি না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে মহারাজ ব্যক্তিগত শোকতাপকে অগ্রাহ্য করে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন শেষ
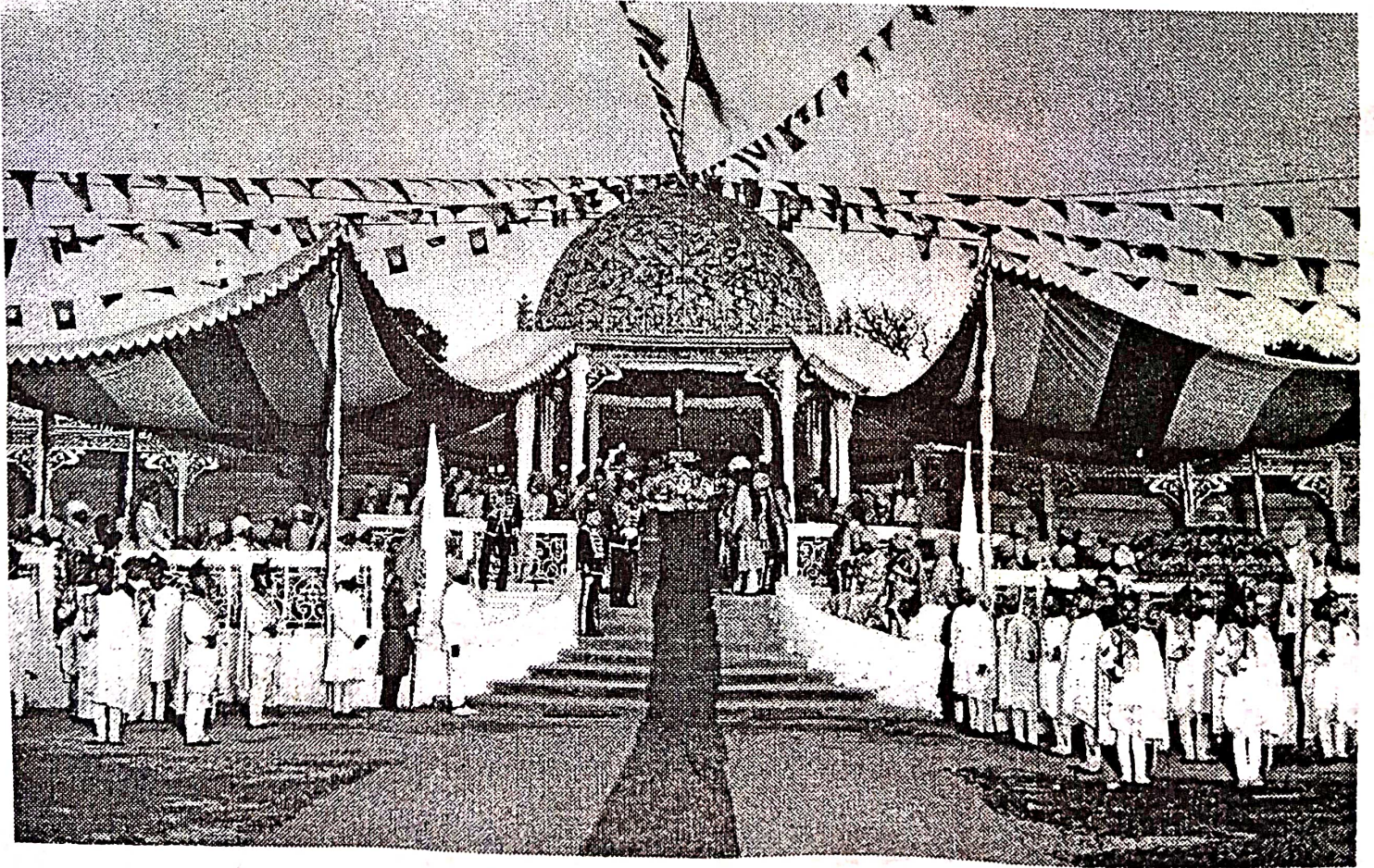
রাজ্যাভিষেক নজর দরবার, আগরতলা

শরনার্থীর জীবন রক্ষার্থ্যে। ক্ষত্রিয় ধর্মের সারই হল শরনাগতকে শরন দিয়ে তাকে রক্ষা করা। মহারাজ বীরবিক্রম সেদিন তাঁর ক্ষাত্রধর্ম পালনের কর্ত্তব্যে বিজয়ী হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের সর্বজন পরিচিত ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক শ্রী বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহারাজের পার্শ্বচর ও সচিব শ্রদ্ধেয় শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একটি চিঠি লিখেন — "All roads lead to Tripura now and all eyes are directed towards its wonderful ruler with reverence & love. Tripura has done a miracle and has exorted the admiration of the whole country. May the flag of Tripura fly aloft for all time to come.... I am afraid you are all extremely busy with his Highness who is personally succouring the 'Daridranarayan' " মহারাজের দুর্গতদের আশ্রয় দেবার কথায় রবীন্দ্রনাথ যে কী রকম গৌরববোধ করেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই তাঁর 'ভারত ভাস্কর' উপাধি গ্রহণের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে— 'বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুন আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে রাখল।" একদা বন্ধু রাধাকিশোরের জন্য যে গান রচনা করেছিলেন কবি 'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা'— তাকে সত্যরূপ দিলেন পৌত্র মহারাজ বীরবিক্রম— 'ক্ষীণজন ভয়তারন অভয়তব বাণী/ দীনজন দুঃখহরণ- নিপুন তব পানি।' মহারাজ নিজ মাতৃভূমি ত্রিপুরাকে যে কীরকম ভালবাসতেন তা আমরা তাঁর অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে দেখতে পাই। ১৯৩৯ খৃঃ কলকাতায় 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার' নিজস্ব ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে উনার ভাষণে সে দিক্‌টির পরিচয় মেলে— 'সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জন্মভূমির সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্রিপুরাবাসীর অন্তরে এই ঋষিবাক্য চির জাগরুক থাকুক— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।' একই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখতে হবে যে মাণিক্য বংশীয় সকল নৃপতিই ভারত আত্মার সঙ্গে একই সূত্রে বাধা যুগান্তর ধরে। ভারতীয়ত্বের মানসিকতায় উজ্জ্বল এবং

স্বদেশী আচরনে বিশ্বাসী মহারাজ বীরবিক্রমের দৃষ্টিকোন ছিল পরিস্কার। আঞ্জুমান -ই-ইস্‌লামিয়া তে প্রদত্ত ভাষণে মহারাজ বলেছেন — 'আমার মত এই যে, পরিণামে একমাত্র সম্মিলিত প্রাচী প্রতীচীই জয়শ্রীমন্ডিত হইবে, যদিচ, আপনাদিগের প্রত্যেকেরই মত আমিও উপলব্ধি করে যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি, প্রাচীনত্বের গৌরবে গরিষ্ঠ-বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন্ন ধর্মের ঔদার্য্যে মহিমান্বিত প্রাচীর অবিমিশ্র আদর্শদ্বারাই সুদৃঢ়ভাবে রচিত হওয়া অবশ্য সঙ্গত।' আজ এই ক্ষুদ্র পরিসরে মহারাজ বীর বিক্রমের মত ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ন চিত্র অংকন করা অসম্ভব। মহারাজের বিদেশ ভ্রমণ ও তার তাৎপর্য্য, তাঁর রাজ্যস্থ ক্রিয়াকাণ্ড, জনকল্যাণমুখী চিন্তাধারা, তাঁর আমলে ললিত কলার বিকাশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহারাজের ভূমিকা এবং ভারতীয় রাজণ্যমন্ডলিতে স্বাধীনতা উত্তর পরিস্থিতিতে ভারতীয় নৃপতিবর্গের ভূমিকা নির্ধারনে তাঁর সদর্থক ভূমিকা, এতসব বিষয়ে আলোচনা একদিনে সম্ভব নয়। আজ প্রয়াত মহারাজাকে সম্মান জানানোর এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। কারণ স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও রাজ্যের জনগণ বিভিন্ন বেদনাদায়ক অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে মহারাজ বীরবিক্রমকে যেন আরও বেশী করে উপলব্ধি করছে এবং মনে মনে অহরহ আত্তড়াচ্ছে এই বলে — 'আজ যদি বীরবিক্রম থাকতো।'

মহারাজ বীরবিক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্য্যসারনি

আধুনিক ত্রিপুরার সবচাইতে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর। যুগান্তর ধরে ত্রিপুরার রাজবংশ এক ব্যাতিক্রমী সনাতন ধারার সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র হিসেবে ধর্মের পাশাপাশি সুকর্মেরও এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল যা ছিল সমস্ত রকম লুপ্ত উজ্জ্বল প্রজ্ঞান ঋষিবাক্যের ব্যবহারিক স্বরুপ। আর এই ব্যবহারিক স্বরুপ যেন মূর্ত হয়েছিল মহারাজ বীরবিক্রমের মাধ্যমে। সুতরাং সজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যেই উদ্ভাসিত ছিলেন প্রয়াত মহারাজ। তাঁর স্বল্পায়ূ জীবনের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করলে শ্রদ্ধা ও সমীহের সাথে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

১। একজন প্রকৃত দেশনায়ক—

মহারাজ বীরবিক্রম মাত্র ঊনচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। মাত্র ১৯ বছরের রাজত্বে যে নেতৃত্বসুলভ আচরন তার প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা গিয়েছিল তা এক কথায় অদ্বিতীয়। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল সেই কৈশোরেই। ১৯২২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণে পদার্পন করেন। কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজ প্রতিনিধিরা প্রিন্স অব ওয়েলসের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সে সময় স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তাই বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে চৌদ্দ বছরের বীরবিক্রমকে পাঠান। বীরবিক্রম সেই অপরিণত বয়সেই ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। ১৯২৫ খৃঃ মাত্র সতেরো বছর বয়সে ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিডিং এর সঙ্গে দেখা করেন। সে বছরেই বাংলার গভর্নরের সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যাভিষেকের পর কুমিল্লাতে আঞ্জুমান ইসলামিয়া

তে ভাষন দেন সেখানে তিনি সর্ব ধর্মের প্রতিই তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জানান এবং বলেছিলেন যে— "আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার আদর্শের সাধনা সেদিন সার্থক হইবে, আমার আশা আছে, সেই পরম শুভদিনে, যে সম্প্রদায় বিচারের উপর বর্তমান মানববুদ্ধি আজ অর্থ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, ভাস্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহিত হইবে। সেদিন, হিন্দু অথবা মুসলমান আমার প্রিয়পাত্র একথা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন সম্পূর্ণ অর্থশুন্য প্রতিপন্ন হইবে। আজ আমি একজন রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতিবর্ণের কল্যাণের ভার সমর্পন করিতে পারিতেছি; আমার সে কাঙ্খিত দিনে, আমার আদর্শ-বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবা তৎপর তত্ত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার আমি হৃষ্টচিত্তে অর্পন করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিব।" তিনি তাঁর যে আদর্শের কথা এখানে বলতে চেয়েছেন তা ছিল স্থান কাল পাত্র ভেদে এক আদর্শ নিরপেক্ষ সমদৃষ্টির। তিনি এই ভাষনের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির পথও বাতলেছেন যা ছিল উদার নিরপেক্ষ সমদৃষ্টির এবং উক্ত এই পথের পথিক মুসলিমরা যেদিন হিন্দুদের রক্ষা করবে সেদিন তিনি পরম শান্তি লাভ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি যখন এই ভাষন দেন তখন ভারতের সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার নিরিখেই এই ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভিন্ন ধারার এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক আদর্শ সমাজ তিনি নিজের রাজ্যে গড়েছিলেন। রাজ্যাভিষেকের দুবছর পর ১৯৩০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মহারাজ প্রথমবার বিদেশ ভ্রমনে বের হোন। সেই যাত্রায় মহারাজ সমগ্র ইয়োরোপ ভ্রমন করেন। নেপলস্, রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, মন্টে কার্লো প্যারিস, লন্ডন, ব্রাসলস, এডিনবরা, গ্লাসগো, বেলফাস্ট, ডাবলিন, হগ্, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, ভেনিস ইত্যাদি শহরে পর্যটনে যান। কিন্তু শুধুমাত্র ভ্রমন পিপাসু পর্যটকের মত যাত্রাকে পরিব্যাপ্ত রাখেননি। সেখানে এক রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকাও তাকে পালন করতে হয়েছিল এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে মিলনের ফলে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তিনি হিজ হাইনেস পোপ-পাইয়াস; ইটালির রাজা, বেনিটো মুসোলিনি, মোনাকোর রাজপুত্র, বেলজিয়ামের রাজা,

ইংল্যান্ডের রাজা, ইংল্যান্ডের রাণী, ওয়েলস্‌র যুবরাজ, ডিউক অব কনাট, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি মিকলাস, এডমিরাল হর্টি, হাঙ্গেরীর রিজেন্ট প্রমুখ বিশ্ব বরেন্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের উচ্চ আদর্শের প্রচার করেন। যেখানেই গেছেন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রনায়কের মত সম্মান ও অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। বেনিটো মুসোলিনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তিনি মহারাজকে তাঁর একটি মূর্তি উপহার দিয়েছিলেন যা আজও উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। তিনি ১৮ ই অক্টোবর ১৯৩০ খৃঃ আগরতলায় ফিরে আসেন। ইয়োরোপ থেকে ফেরার পর মহারাজ সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হল (১৪ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খৃঃ) খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর গ্রামে এক সপ্তাহের জন্য ক্যাম্প। সেখানে সাতদিন রাজ্যের ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রজাসাধারনের সঙ্গে কথা বলেন ও মতামত বিনিময় করেন। তিনি রাজ্যের পার্বতীয় জনসাধারনকে হল কর্ষন চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেই উপলক্ষে খোয়াই নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ২০শে ভাদ্র ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে এগার হাজার দ্রোণ ভূমি সংরক্ষিত করেন। এই ঘটনায় প্রজারা ভীষনভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন কারণ প্রথমবার কোন রাজা তাদের মধ্যে সাতদিবস থেকে তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনেছেন অত্যন্ত আবেগের সাথে এবং তাদেরও উন্নতির পথে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। মহারাজ বীরবিক্রম ১৯৩৩ কলকাতায় ভাইসরয় লর্ড উইলিংগডন এবং গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে মহারাজকে জার্মান কনসুল থেকে আমন্ত্রন জানানো হয় জার্মান সমুদ্রতরী কার্লস্রুহে তে। মহারাজ এরপর ২রা জানুয়ারী ১৯৩৮ খৃঃ নৌসেনা প্রধানের সঙ্গে ব্রিটিশ রনতরী এন্টারপ্রাইজে প্রীতি ভোজসভায় মিলিত হন। ১৯৩৫ সালের শুরুর দিকে মহারাজ রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিদর্শনে বের হোন রাজ্যের মিলিটারী বাহিনী, ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলির সর্দারগন এবং ভলান্টিয়ারগন পরিবৃত হয়ে। সেই যাত্রায় অম্পিনগর, অমরপুর, ডম্বুরনগর, মুহুরীপুর, পিলাক, বিলোনীয়া এবং ফেনী পরিদর্শন করেন। ১৯৩৫ মার্চ মাসে মহারাজ কলকাতায় ভারতীয় নৃপতি বর্গদের আমন্ত্রন জানান এক বিরাট ভোজসভায়। এই বছরেই মহারাজ কে, সি, এস, আই

উপাধিতে ভূষিত হন ব্রিটিশ সরকার দ্বারা। ১৯৩৬ খৃঃ মহারাজ দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমনে রাজ্যত্যাগ করেন। এইবারের যাত্রায় তিনি এডেন, পোর্ট সৈয়দ, মার্সেই, ডাভোস, লন্ডন, জুরিখ, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মিলান, নাইস, কানস্, ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমন করেন। এই যাত্রাতেও মহারাজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এমনি এক নেতা ছিলেন হিটলার। মহারাজকে অনেকে বারন করেছিলেন হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে হিটলারের খামখেয়ালি মনোভাবের জন্য। কিন্তু মহারাজ বীরবিক্রমও জেদ ধরলেন একবার হিটলারের সঙ্গে দেখা করবেনই কারণ হিটলারকে নিয়ে তখন সারা বিশ্ব তোলপাড়। মহারাজ গেলেনও দেখা করতে এবং হিটলার মহারাজকে যথেষ্ট আপায়নও করেন। হিটলার পৃথিবীর ম্যাপ দেখিয়ে মহারাজকে বলেন তিনি মহারাজের রাজ্য সম্পর্কে জানেন এবং মহারাজকে রাজ্যে ফিরে অর্কিড চাষের জন্য উদ্যোগী হতে বলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মহারাজ সেবার বার্লিন ত্যাগ করেন। ১৯৩৬ খৃঃ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আইনের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভারতে যোগদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সভা হয়। সেই সভায় মহারাজ বীরবিক্রমও যোগদান করেন। ১৯৩৭ খৃঃ মহারাজ এক চিঠির মাধ্যমে ত্রিপুরার ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদানের সম্মতি জানান। যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার পর তাদের অবস্থান নিয়ে, বীরবিক্রম তাঁর যোগদানের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আবারো প্রমান দিলেন তাঁর প্রত্যুত্বপন্নমতিত্বের ও দূরদর্শীতার। মহারাজ রাজ্যে তাঁর প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাছিলেন। মহারাজ ২৫ নভেম্বর ১৯৩৮ খৃঃ বম্বেতে চেম্বার অব প্রিন্স বা নরেন্দ্র মণ্ডলের সভাতে যোগদান করতে যান। সেখানে মহারাজকে পূর্ব ভারতের রাজন্যবর্গকে একত্রিত করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃতি পান। সেই বছরেই কোলকাতায় মহারাজ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথ্‌গো ও গভর্নর জেনারেল লর্ড ব্রেবোর্ন কে আপ্যায়িত করেন। ক্ষত্রিয় মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে (২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৮) সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভাতে মহারাজের ভাষণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করা হয়েছিল। তৃতীয়বারের জন্য মহারাজ বীরবিক্রম সমগ্র বিশ্ব

ভ্রমনে বের হোন। সেবার ফ্রান্স, ইংল্যান্ড আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, বালি, মালয় শিঙ্গাপুর ও বাঁর্মা ভ্রমন করেন। যাত্রার মধ্যে লন্ডনের স্যাভয় হোটেল থেকে মহারাজ ভাইসরয় কে চিঠি লেখেন এবং ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত জানান। ১৯৪০ খৃঃ প্রসিদ্ধ ভারতীয় নরেন্দ্র মণ্ডলের সভার আয়োজক নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আবহে মহারাজ ত্রিপুরাবাসীকে ত্রিপুরার অবস্থান ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় নীপিড়ীতদের পাশে তাঁর প্রশাসনকে সদা সজাগ রাখেন। ১৯৪১ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর ন্যাশানাল ডিফেন্স কাউন্সিল এর মিটিং এ অংশগ্রহন করেন। আগরতলা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে জাপানি সৈন্য ও ব্রিটিশ শক্তির মধ্যেকার এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিনত হয়। মহারাজ তাঁর সৈনীবাহিনীকে অত্যন্ত কুশলতার সাথে তৈরী করেন এবং জাপানী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সূচারুভাবে নিয়োগ করেন। ১৯৪৩ খৃঃ মন্বন্তরের সময় ত্রিপুরার রাজন্য প্রশাসন বেশী করে খাদ্য তৈরীর স্লোগান ছড়ায় রাজ্যে। সেই দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ রাজ্যে খাদ্যের গোদাম তৈরী করেন এবং উপযুক্ত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করেন। এর ফলে ত্রিপুরা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বেচেঁ যায়া। এর মাধ্যমে মহারাজের দূরদর্শিতা ও যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৬ খৃঃ ব্রিটিশ সরকার মহারাজকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। বার্মা থেকে ত্রিপুরা সৈন্য বাহিনী যখন ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খৃঃ কলকাতায় অবতরন করে মহারাজ স্বয়ং যান তাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রকৃত দেশনায়কের মত। ত্রিপুরা বাহিনীর অবিস্মরনীয় অবদানের জন্য ফিল্ড মার্শাল লর্ড অচিনলেক মহারাজকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন—"Now that the Tripura rifles have finally returned to the state, I would like to record my gratitude to your Highness for having placed them at the disposal of the crown during the war.............. they have covered many miles in Burma during these long years of war and have always earned the highest praise from the commanders under whom they have served. They have made the name of Tripura

famous.” তিনি জনশিক্ষা সমিতি ও ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডলের ভূমিকা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাই ১৯৪৬ নিজে গড়লেন ত্রিপুর সংঘ। কিন্তু দূর্ভাগ্য ত্রিপুরার মহারাজের এই প্রয়াসকে সবাই ভুল বুঝেছিল সেদিন। মহারাজ ১৯৪৭ এর শুরুর দিকে সমগ্র পূর্ব ভারতের রাজ্য ও সর্দারদের নিয়ে শিলঙে একটি আঞ্চলিক ফেডারেশন গড়ার ও প্রয়াস নিয়েছিলেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। একজন রাষ্ট্রনেতার যা কিছু করণীয় সেসব কিছুরই সুন্দর রুপে পরিস্ফুট হয়েছিল মহারাজের স্বল্পায়ু জীবনে। তিনি বর্তমান ও আগামীদিনে এক বিরল দেশনায়কের উদাহরণ হিসেবে চিরঞ্জিবী থাকবেন। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুসভেল্টের সাথেও দেখা করেছিলেন। হোয়াইট হাউসে তাকে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। তিনি ‘ভয়েস অব আমেরিকা’ তে ভাষনও দেন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানী করেন। এতে উনার দূরদর্শীতার প্রমান পাওয়া যায়।

২। বীরনায়ক বীরবিক্রম—

ত্রিপুরা যুগ যুগ ধরেই তাঁর ক্ষাত্র তেজের পরিচয় দিয়েছে। যদিও ব্রিটিশ শাষনের শুরুতে সেই ক্ষাত্র তেজ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল কারণ ব্রিটিশ যুগে তেমন যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি কিন্তু সম্পূর্ণ রুপে নিভেও যায়নি। সেই ঘুমন্ত শক্তি কে পুনরায় নবজীবন দান করেছিরেন মহারাজ বীরবিক্রম। মহারাজ নিজে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে রাজ্যের সামরিক শক্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর হাতেই সুযশের অধিকারী প্রথম ত্রিপুরা রাইফেলস ও অন্যান্য সামরিক বিভাগের সৃষ্টি হয়। এই প্রথম ত্রিপুরা রাইফেলস বা ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুদূর বার্মাতে কুখ্যাত জাপানি সৈন্য কে পর্যদুস্ত করে সারা পৃথিবীতে বাহবা কুড়িয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকার এই বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ সেদিন ত্রিপুরা রাইফেলস্‌কে কমপক্ষে ৮০ টির মত বিভিন্ন সামরিক পুরস্কারে ভূষিত করে। মহারাজ বীরবিক্রম সেদিন নাইট উপাধিতে ভূষিত হন তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের জন্য।

৩। সাহিত্য সংস্কৃতির গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক—

ত্রিপুরার রাজারা যুগ যুগ ধরে যেমন ললিত কলার উত্তম রসবোধের

অধিকারী ছিলেন তেমনি আবার নিজেরাও কলাঙ্গনের একজন গুনী কুশীলবও ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করেই মহারাজের আমলে সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। তিনি নিজে একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন'। একজন সুদক্ষ সেতারী ছিলেন। চিত্রকলার উন্নয়নে তিনি শিল্পীদের রাজদরবারে চাকরী দিয়েছিলেন যেমন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সুরেশ দেববর্মাকে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের চিত্রকর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর দরবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের নিয়মিত চর্চা হত। উস্তাদ আলাউদ্দিন খান, এনায়েৎ খান, অনিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরা নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। মহারাজ নিজে নাটক ও অসংখ্য হোলি সংগীত রচনা করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই বিখ্যাত 'রবি' ও 'জাগরণ' পত্রিকা ত্রিপুরায় মুদ্রিত হত। ১৯৩১ খৃঃ কলকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে চিত্রকলা প্রদর্শণীয় উদ্বোধন করেছিলেন। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত অল বেঙ্গল লিটারেরী কনফারেন্স, পুরীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলনের উদ্বোধনাদি কার্য্যের দ্বারা মহারাজের সাহিত্য কলা শিল্পের প্রতি অনুরাগের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তিনিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর আশিতম জন্ম বার্ষিকীতে "ভারত ভাস্কর" উপাধি দ্বারা সম্মনিত করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সম্মান জানিয়েছিলেন। মহারাজ রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, রয়েল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি এবং রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার, লন্ডনের আজীবন ফেলো ছিলেন।

৪। শিক্ষানুরাগী আধুনিক প্রশাসক—

অত্যন্ত দূরদর্শী রাজা হিসেবে মহারাজ বীরবিক্রম বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করতে না পারলে সমাজ ও দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৩১ খৃঃ মহারাজ সারা রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন বলবৎ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে এই পদক্ষেপটি আজও ঐতিহাসিকভাবে অদ্বিতীয়। মহারাজের শাষনকালে তিনশটিরও অধিক স্কুল খোলা হয়। মহারাজ বর্তমান এম বি বি কলেজ প্রাঙ্গনে একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে "বিদ্যাপত্তন" নামে এক অভূতপূর্ব উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্প গ্রহন করেন যেখানে সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন, কারিগরীবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের

মত আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাজের জীবিতকালে এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পটির বাস্তাবায়ন দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে বীরবিক্রম কলেজটিই শুধুমাত্র নিদর্শন রুপে থেকে যায়।

৫। প্রশাসনিক সংস্কার—'দূরদর্শী রাজা'—

মহারাজের দূরদৃষ্টির প্রথম উদাহরণই যদি দিতে হয় তবে সেটা হল আগরতলা বিমানবন্দর। যে সময়ে সারা ভারতবর্ষে হাতে[illegible]না গুটিকয়েক বিমানবন্দর ছিল তখন মহারাজ উদ্যোগ নিয়ে বিমানবন্দরটি গড়ে তোলেন। তিনি হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ভারতের অবশ্যম্ভাবী বিভাজন। দেশ বিভাজিত হলে যে ত্রিপুরাই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগের সুফল এখনও আমরা ভোগ করছি। এছাড়াও

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা

আখাউড়া থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত তিনি রেলপথ নির্মানের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি। না হলে ত্রিপুরাবাসী রেলপথের সুযোগ সে যুগেই পেতে পারতো। রাজ্য প্রশাসনের সার্বভৌম অধিকারী হবার পর মহারাজ বীরবিক্রম প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন আনেন। আধুনিক বিশ্ব জগতের সঙ্গে মানানসই তথা স্বদেশী ধারায় উজ্জীবিত এক উন্নয়নকামী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ...রেন। রাজা হবার পরই রাজধানী আগরতলার সৌন্দর্য্যায়নে হাত দেন। আগরতলা পুর পরিষদকে পুনর্গঠিত করেন। রাজধানীর নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান। বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য হাওড়া নদী ও কাটাখালের বাধ দেন। ডিমসাগর খনন করান শহরের উত্তরাংশে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করবার জন্য। আগরতলা শহরে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও বিদুদ্বায়নেরও ব্যবস্থা করান। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্...নের জন্য প্রতি মহকুমায় উন্নয়ণ বিষয়ক নগর সমিতি গড়েন। সারা রাজ্যে রাস্তাঘাট উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি একটি "পূর্তবত্ম সংক্রান্ত উন্নয়ন সমিতি গঠন ...ছিলেন যার ফলে ধর্মনগর থেকে ফেনীর তীর অব্দি রাজ্যে ব্যাপক হারে রাস্তাঘ... হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য ৪ঠা ...৪ খৃঃ ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক স্থাপিত করেন। এছাড়া সামাজিক স্বাস্থ্য বি... ও শিল্প স্থাপনে মহারাজার পরোক্ষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

৬। সমা... ...দার ধার্মিক দেশনায়ক—

...ক্রম ছিলেন একজন উদার আধুনিক হিন্দু ধর্মের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ মূল্য... ...রক্ষনশীল ব্যাক্তি। পাশাপাশি সমাজের উন্নতিকল্পে প্রাচীন গ্রহণীয় প্রথা... ...সূচক পদক্ষেপ নিয়ে আধুনিক জগতের নবীন রীতি নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ...াজিক সংস্কার করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলী, মণিপুরী ক্ষত্রীয় মণ্ডলী, লস্কর মণ্ডলী ইত্যাদি। তিনি ১৯৩৫ খৃঃ মায়াপুর স্থিত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত মন্দির উদ্বোধন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে লন্ডনে যে প্রথম হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই মন্দির নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহন করেন মহারাজা বীরবিক্রম। ১৯৩৮ খৃঃ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় মহাসভার

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন মহারাজ বীরবিক্রম। ১৯৪০ খৃঃ আগরতলার কুঞ্জবনে বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করা একাধারে যেমন তাঁর উদার ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় দেয় তেমনি দূরদর্শীতারও প্রমান দেয়। মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যতে পার্বত্য প্রজাদের পক্ষে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পরবে। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করে যদি পার্বত্য প্রজারা সনাতনী ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল বুদ্ধমন্দির [illegible]তিষ্ঠার মধ্যে। এছাড়াও মহারাজ আঞ্জুমান এ ইসলামিয়া, খাদিউল ইসলাম ইত্যাদি মুসলমান সভাতেও অংশগ্রহণ করতে পিছপা হননি। মহারাজ বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মীয় সদ্ভাব বজার রাখার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

৭। মানবতাবাদী রাজা—

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ[illegible]পমহাদেশ জর্জরিত, ঠিক এই সময়েই নীপিড়ীত্ত নির্যাতিত অসহায় মানুষদে[illegible]শ্রয়দাতার ভূমিকায় আবতীর্ন হন মহারাজ। ঢাকার ১৯৪১ খৃঃ দাঙ্গা ও নো[illegible] ১৯৪৬ খৃঃ নৃশংস দাঙ্গায় নিপীড়িত মানুষদের একমাত্র আশ্রয় হয়ে উ[illegible]ক্রমের ত্রিপুরা। মহারাজ নিপীড়িত মানুষজনদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের[illegible] তার রাজ্যে। সেই সব মানুষদের বিপদের সময় বিপদভঞ্জনে[illegible]জ। ১৯৪৩ খৃঃ বাংলার দূর্ভিক্ষের সময়ও অসহায় মানুষ[illegible]ানের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন অর্ভূত পূর্ব রেশনিং এর মাধ্য[illegible]লতে দ্বিধা নেই যে তিনি ছিলেন এক গভীর মানবতাবাদী [illegible]

৮। সাংবিধানিক সংস্কার—আদর্শ শাষক—

একজন আদর্শ শাষক তখনই বলা যাবে যখন সে[illegible]জ ও দেশের উন্নয়নে যুগপযোগী ব্যবস্থা কে নিরন্তর স্বাগত জানায় এবং যুগের [illegible] একত্রীকরণ করে দেশের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। মহারাজ বীরবিক্রমের শাষনকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের খণ্ডকাল ছিল। নির্বিঘ্নে মহারাজ রাজ্য শাষন করেননি। একদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার যার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি অন্যদিকে রাজ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক

শাষনব্যবস্থার জন্য প্রতিনিয়ত আন্দোলন মহারাজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত করে তুলেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজতন্ত্র তথা ত্রিপুরার সনাতনী ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় শাষন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক এক পরিকাঠামো গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে সমগ্র প্রশাসনের তিনি বিকেন্দ্রীকরণ ঘটান এবং গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি চালু করেন। একটি আধুনিক সংবিধানে[illegible]না করান দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা (bicameral legislature), প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটাধিকার (adult franchise), নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, পঞ্চায়েতী রাজ এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রতি প্রযোজ্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। তাঁর আমলেই ১৯৪৫ খৃঃ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আগ[illegible]তলা মিউনিসিপালিটির নির্বাচন সংঘটিত হয়।

৯। স্বদে[illegible]বনায় উদ্বুদ্ধ এক ব্যাতিক্রমী রাজা—

[illegible]র রাজারা সর্বদাই প্রাচীন সনাতনী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক[illegible] ছিলেন। এই ধারার ব্যাতিক্রম ঘটেনি মহারাজ বীরবিক্রমের শাষনেও। তাঁর[illegible]দক্ষেপে সেই ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাজসভার উদ্বোধন উপ[illegible]র্তিক, ১৩৫১ ত্রিং, ১৯৪১ খৃঃ) মহারাজ তাঁর ভাষনের মাধ্যমে প্র[illegible]কে যে দিশা নির্দেশ করেছিলেন সেটি ছিল স্বদেশী ভাবনায় উ[illegible]ণ্ঠ উদ্দেশ্যে পৌছুনোর জন্য মহারাজ বলেছিলেন যে— "w[illegible]l of traditional Indian culture harmonising wi[illegible] in shaping the guiding principle of the governi[illegible] to render the state invulnerable in the prosperity, [illegible] and contentment of the people."। অর্থাৎ চিরাচরিত ভারতীয় স[illegible]তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্যেই দেশের ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা যাবে। এরও বহু আগে ১৯২৮ খৃঃ কুমিল্লায় আঞ্জুমান-এ-ইসলামিয়া তে প্রদত্ত ভাষনে দেখা যাচ্ছে যে মহারাজ বলছেন যে— "ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রাচীনত্বের গৌরবে গরিষ্ঠ, বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন্ন, ধর্ম্মের ঔদার্য্যে মহিমান্বিত;" এবং প্রাচী প্রতীচীর সম্মিলিত পদক্ষেপই আমাদের

জয় নিশ্চিত করবে। এই ভাবধারায় নিঃসন্দেহে এক মহান দেশপ্রেমিক রাজার চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল অবস্থা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন সমগ্র পৃথিবী এবং ভারতবর্ষে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই অনিশ্চয়তার সময়ে মহারাজ কে তাঁর রাজ্য ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার সুরক্ষা ও সুস্থিতির কথা চিন্তা করে ভারতীয় গণরাজ্যে নিজ রাজ্যের সং[illegible]করনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে যান। ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সম্ভবত ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যা ভারতীয় গণরাজ্যে যুক্ত হবার বাসনাব্যক্ত করেছিল। মাত্র উনচল্লিশ বছরের জীবনে যে কর্মযজ্ঞের উদাহরণ মহারাজ স্থাপন করে গেছেন তা খুব কম শাষকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। মহারাজ সপ্ন দেখার সাহ[illegible] দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্মভূমি ও মানুষের প্রতি একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ক[illegible]ডর কল্পনাও ছিল তার অন্তরাত্মায়।
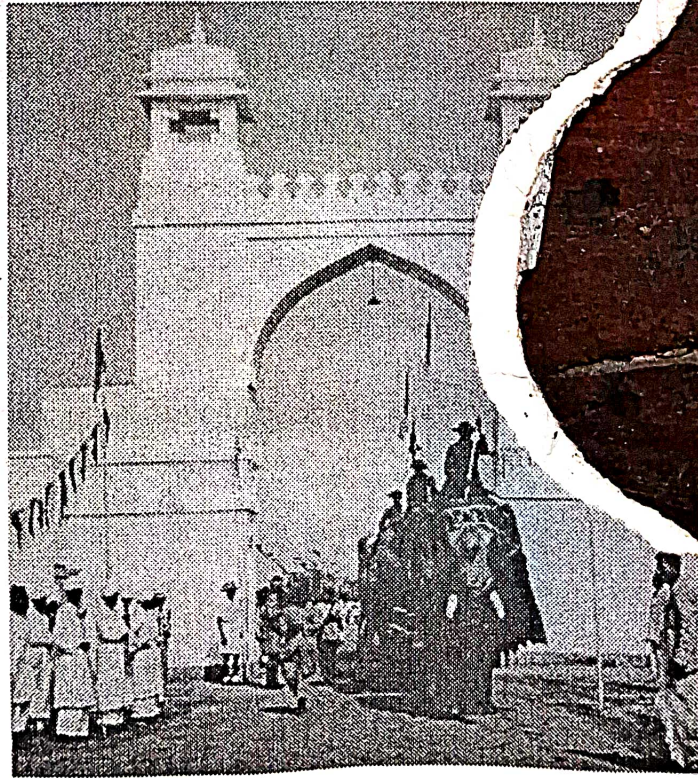
উত্তর গেইট, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, আগরতলা

ল্লী দরবারে ভারতীয় নৃপতিবর্গ।
শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ত্রিপুরার
বীরচন্দ্র দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর।